মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভবুদ্ধির আদর্শ

শিকদার মুহাম্মাদ কিব্রিয়াহ

মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভবুদ্ধির আদর্শ
শিকদার মুহাম্মাদ কিব্রিয়াহ

প্রকাশক
আবদুল কাদের তাপাদার
শতাব্দী কালচারাল গ্রুপ
বন্দর বাজার, সিলেট

প্রকাশ কাল
মে. ১৯৯৭ ঈসায়ী
মুহাররম, ১৪১৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪ বাংলা

স্বত্ব
লেখকের

প্রচ্ছদ
রায়হান উদ্দিন চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
সাইমুম কম্পিউটার্স
১২৭ রাজা ম্যানশন (৩য় তলা)
জিন্দাবাজার, সিলেট।

মুদ্রণে
রাবেয়া অফসেট প্রিন্টার্স
৪র্থতলা, মধুবন সিলেট

মূল্য
৪০ টাকা

উৎসর্গ-

স্বগত ঃ উচ্চারন

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আমার ছয়টি প্রবন্ধ এবং নতুন লিখা তিনটি প্রবন্ধের সমন্বিত প্রয়াস এ-ই গ্রন্থটি। প্রবন্ধ গুলো বিশ্লেষনধর্মী, গবেষণামূলক এবং সর্বোপরি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য হওয়ার কারনে সাধারণ পাঠকদের চাহিদা মেটাতে হয়ত পুরোপুরি সক্ষম হবেনা- এজন্য আমি আন্তরিকভাবে এ সীমাবদ্ধতাটুকুর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রবন্ধ গুলো মূলত সেই সব ব্যক্তিত্বদের জন্য উপযোগী বলেই মনে করি যাঁরা মুক্তবুদ্ধিবৃত্তির আলোকে জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানে প্রয়াসী। আমার বাস্তব জীবনের আত্মস্থ অভিজ্ঞতায় এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু খুবই মৌলিক ভাবে বিবেচ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে এ প্রাসঙ্গিক লিখায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার ফলশ্রুতি এই প্রবন্ধ গুলো যদি মুক্তবুদ্ধির ধারক, বাহক ও দাবিদারদের সামান্যতম চিন্তার ইতিবাচক খোরাক দিতে সক্ষম হয় তবেই আমার এই নগন্য প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলেই অনুমিত হবে। এ-ই লিখাগুলোর জন্য আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। সবই তাঁর যে পরমসত্তা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাকে লিখার যোগ্যতা ও তাওফিক দিয়েছেন। সর্বান্তকরনে আমি তাঁর শুকরিয়াহ্ আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাদের সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরন করছি - বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি জনাব এ.কে.এম নাজির আহমদ, সিলেটের বিশিষ্ট রাজনীতিক জনাব ডাঃ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ ইকরামুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, বন্ধুবর ডাক্তার মাশুকুর রহমান, আমার ছোটবোন লেখিকা আফিয়া শিকদার হাসী; জীবন সংগীনি ফারহানা শিকদার, যাদের আর্থিক সহযোগিতা বইটি প্রকাশের পথ সুগম করেছে - আমার শ্রদ্ধাভাজন ভগ্নিপতি জনাব কাস্তান মিয়া এবং স্নেহধন্য সাজিদ মুহাম্মদ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার সেই বন্ধু সত্তাটির যার অস্তিত্ব এ-ই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের প্রেরণা, প্রেক্ষিত ও উপজীব্য। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই বইটির প্রকাশক শতাব্দী কালচারাল গ্রুপ, সিলেট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক জনাব আবদুল কাদের তাপাদার এবং নির্বাহী পরিচালক তরুণ লেখক মুহাম্মদ জুবায়ের এর প্রতি।

আল্লাহ আমাদের সবার প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

গোয়ালা বাজার, সিলেট
পহেলা মে '৯৭

শিকদার মুহাম্মাদ কিব্রিয়াহ্

ভূমিকা

চিন্তা ও বিবেকের ক্ষেত্রে এক নতুন তাগিদ নিয়ে, সম্পূর্ণই এক নতুন, ব্যতিক্রমী অথচ বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে তরুন বুদ্ধিজীবি - লেখক জনাব শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ্‌র লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের গ্রন্থনা 'মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভ বুদ্ধির আদর্শ'। জীবন ও জগতের সাথে ঘনিষ্ট নানাবিধ অনুসংগ ও বিষয় সম্পর্কে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য দার্শনিক - মনীষীদের অভিমত ও বক্তব্য লেখক তার স্বাভাবিক দার্শনিকসুলভ প্রজ্ঞায় এক অসাধারণ ভংগীতে বিশ্লেষণ করে ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে এর পার্থক্য অথবা সাযুজ্যতা বের করে পাঠককে এক পরমসত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা নিয়ে লেখক তার অন্তর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন প্রতিটি বিষয়ের গভীর থেকে আরো গভীরে। বস্তু ও বিষয়ের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, গঠনপ্রণালী, কার্যকারণ, উত্থান-পতন, পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিকাশের ধারা, বিবর্তন, ইতিহাস, বংশ পরম্পরা, স্বাতন্ত্র, সীমাবদ্ধতা, অধিকার এবং আবেগ, অনুভূতি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা -ইত্যাদির স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে যথার্থভাবে পরিমাপ করে মাত্রা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হয়ে হিসেব - নিকেশ করে এক শাশ্বত জীবনাদর্শ উপস্থাপন করবার নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফসল এই ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানি। 'মুক্তবুদ্ধি', 'মুক্তচিন্তা', 'চিন্তার স্বাধীনতা', 'ইচ্ছার স্বাধীনতা', - ইত্যাকার শব্দমালার আড়ালে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বর্তমান সময়ে জাতির অস্তিত্বও স্বকীয়তা, ধর্মবিশ্বাস তথা শাশ্বত সত্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক মানসে চিন্তার যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন তা নিরূপণ করে চুলচেরা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে যুক্তিবাদী লেখক তার সৃষ্টিশীল দার্শনিক প্রজ্ঞায় সর্বোত্তম সত্যকে গ্রহণ করতে পাঠক সমাজকে উৎসাহিত করেছেন।

মুক্তবুদ্ধি দিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে চিন্তাশীল মানুষের সামনে শুভবুদ্ধির আদর্শ উপস্থাপনের জন্য লেখক ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করে মানবজীবনের এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন, স্বাধীনতার স্বরূপ ও চেতনার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অসাধারণ পটভূমিকা ও পরিনতি এঁকেছেন এবং তার নিজস্ব দার্শনিক মননে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা করে মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে তাদের আচরনের বৈপরিত্য তুলে ধরেছেন, হিজাব তথা পর্দা ব্যবস্থাকে তিনি নারী জীবনের এক ঘনিষ্ট-অনিবার্য অনুসংগ হিসেবে দেখেছেন, প্রেম-ভালোবাসার বাস্তবতাকে তিনি যৌক্তিক পর্যায়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সর্বোপরি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা ও নৈতিক কাজের ফলাফলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তিনি শাশ্বত সুন্দর নৈতিকতার এক বিশ্বজনীন আদর্শের দিকে মানব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছেন।

এমন এক সময়ে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে যখন আমরা প্রবলতর এক বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত। আমাদের আত্মপরিচয়, অস্তিত্ব ও সামগ্রিক নিজস্বতাকে ওলট-পালট করে দিতে এক শ্রেনীর 'বুদ্ধিজীবী' আগ্রাসী শক্তির পক্ষালম্বন করে জাতিগত বিনাশী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। এই বইটি তাদের ক্ষেত্রেও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশুদ্ধতা এনে দিতে পারে। বইটি পাঠ করে তাবৎ সত্য-সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা একটি শাশ্বত সুন্দর পথের সন্ধান পাবেনই। বইটি অনেকের জন্য অন্ধকারে 'লাইট হাউস' হিসেবেও কাজ করতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহামহিম আল্লাহতায়ালার অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি।

– আব্দুল কাদের তাপাদার
সিলেট, ২২ মে, ১৯৯৭ ঈসায়ী

বিষয় সূচী

মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভবুদ্ধির আদর্শ ৫

ধর্ম ও দর্শন ঃ সমন্বয় ও সম্ভাবনা ১৫

ইচ্ছার স্বাধীনতা ও নৈতিক কাজের ফলাফল ২০

প্রেমের রিয়্যালিটি ২৬

হিজাব ঃ জীবন ঘনিষ্ঠ একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ ৩১

মানব সৃষ্টি ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৩৭

মুক্তবুদ্ধির চর্চা বনাম জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ৪২

স্বাধীনতার স্বরূপ ও চেতনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৪৬

প্রসঙ্গ কুরবানীর আদর্শ ঃ জাতীয় মূল্যবোধ ও জীবনাচরন প্রেক্ষিত ৫১

মুক্তবুদ্ধির সমীক্ষা ও শুভবুদ্ধির আদর্শ

জীবনের নিমিত্ত যে দর্শন অর্থাৎ প্রকৃত জীবনবোধ থেকে যে দর্শনের উদ্ভব-যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মানব জীবনাদর্শ এবং মানবতার বিকাশ ও বিশ্বজনিন কল্যাণ যার ফলশ্রুতি তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জীবনদর্শন। জাগতিক প্রতিটি জীবনাদর্শই কোন না কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। সেটা হয়তোবা ভাববাদী নয়তো বস্তুবাদী কিংবা বস্তুগত ভাববাদী ইত্যাদি। মুলতঃ তা সংশ্লিষ্ট দার্শনিকের মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাধারার ফসল। কিন্তু প্রশ্ন হল মানব মস্তিষ্ক প্রসূত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত জীবনাদর্শ কি যথার্থভাবে প্রকৃত জীবনদর্শন বা পরম জীবনাদর্শের মর্যাদা পেতে পারে ? সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার জন্য এ জীবনাদর্শ কি কল্যাণকর বিবেচিত কিংবা প্রমানিত হতে পারে ? সহজ কথায় মানুষের তৈরী মতবাদ কি মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে ? মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কি সক্ষম ? এই সব কটি প্রশ্নের জবাব প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক হবে তখনই যখন সংশ্লিষ্ট সেই দার্শনিক মানবসত্তাটি বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের সার্বিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে এবং সেই অর্জিত জ্ঞান তার নিজ মস্তিষ্কে সঠিকভাবে ধারণ করে সচেতনভাবে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, গঠনপ্রণালী, কার্যকারণ, উত্থান-পতন, পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিকাশের ধারা, বিবর্তন, ইতিহাস, বংশপরম্পরা, স্বাতন্ত্র, সীমাবদ্ধতা, অধিকার এবং আবেগ, অনুভূতি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, ইত্যাদির স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে যথার্থভাবে পরিমাপ করে মাত্রা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হয়ে হিসেব-নিকেশ করে জীবনাদর্শ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ে পৃথকভাবে পরমসত্যে উপনীত হতে পারলেই যথার্থভাবে নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। এখন কথা হল, এভাবে একটি একক ব্যক্তিসত্তার পক্ষে স্বল্প মেয়াদী একটি মাত্র জীবনে ; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর, ব্যাপক ও নির্ভুল অধ্যয়ন তথা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরমসত্যে উপনীত হওয়া এবং এ পরমসত্যের আলোকে বিশ্বজনিন পরম জীবনাদর্শ উপস্থাপন করা কি বাস্তবে সম্ভব ? মুক্তবুদ্ধির জবাব হচ্ছে, 'অবশ্যই না'। কোন মানব সত্তার পক্ষে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিটি বিষয়ের কালোত্তীর্ণ নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ দর্শনের তিন হাজার বছরের জানা ইতিহাস থেকে এটা প্রমানীত যে, সার্বিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে এমন

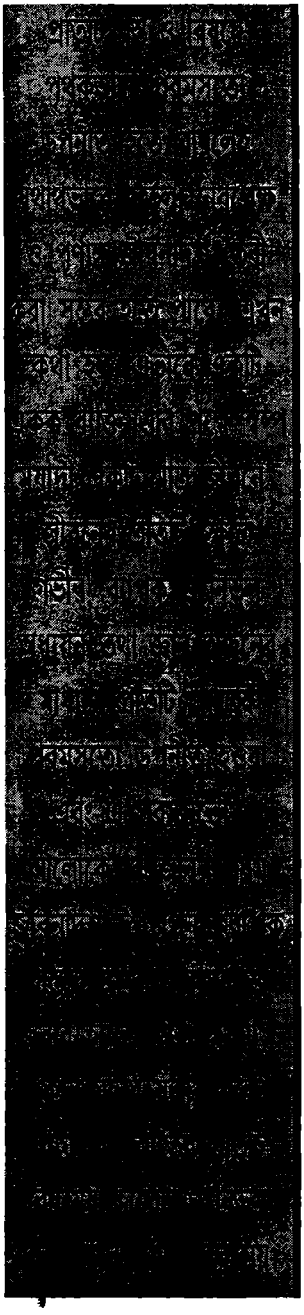

কোন স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি যা সর্বজন স্বীকৃত। জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, যথার্থতা, শর্ত, সীমা প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন মত ও পাল্টামতের উদ্ভব ঘটেছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বুদ্ধিবাদী, কেউ অভিজ্ঞতাবাদী আবার কেউ সংশয়বাদী, কেউবা বিচারবাদী। প্রাচীন যুগের দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরীয় দার্শনিকেরা (খৃষ্টপূর্ব ৫৭০-৪৯৯) জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতির সমর্থক হিসেবে আধুনিক অর্থে তাদেরকে বুদ্ধিবাদী, আবার কখনো কখনো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সমর্থক হিসেবে তাদেরকে অভিজ্ঞতাবাদীও বলা চলে। দার্শনিক হিরাক্লিটাসের মতে, ইন্দ্রিয় প্রদত্ত জ্ঞান প্রামাণিক নয়, প্রজ্ঞাই যথার্থ জ্ঞান। প্রাক সক্রেটিস গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট এলিয়াটিক দার্শনিক পারমেনাইডিসের মতেও যথার্থ জ্ঞানের উৎস পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় নয়, সার্বভৌম ও সার্বজনীন প্রজ্ঞা। বহুত্ববাদী এমপিডক্লিস এবং এনাক্সেগোরাসও ছিলেন প্রজ্ঞাবাদী। পরমানুবাদী ডেমোক্রিটাসও বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সমর্থক। সোফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাস অনপেক্ষ ও সার্বিক (Absolute and Universal) সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন সংশয়বাদী। সক্রেটিস ও প্লেটো ছিলেন বুদ্ধিবাদী। প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষনই জ্ঞান নয়। যথার্থ জ্ঞান হয় অভিজ্ঞতার জগত থেকে বুদ্ধির জগতে উড্ডয়নের মাধ্যমে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এরিষ্টটল অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়টির পৃথক ভূমিকা স্বীকার করেন এবং অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তার মতে, অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব, কিন্তু নিছক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সত্য বড় জোর সম্ভাব্য হতে পারে, সুনিশ্চিত হতে পারে না। সত্যের একটি বৌদ্ধিক বা প্রাকসিদ্ধ ভিত্তি রয়েছে যা কিছু

পাওয়া যায় স্বজ্ঞার (intution) মাধ্যমে এবং বাকী সব পাওয়া যায় সহানুমানিক অবরোহের মাধ্যমে। এপিকিউরীয় দার্শনিকরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ বা সংবেদনকেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস বলে উল্লেখ করেন। এপিকিউরীয় দর্শনের সমসাময়িক স্টোয়িক দর্শনও ছিল অভিজ্ঞতাবাদী । অবশ্য তারা অভিজ্ঞতার ওপর চিন্তার প্রয়োগকে অস্বীকার করেননি। এপিকিউরীয় এবং ষ্টোয়িক দর্শনের পাশাপাশি এক নতুন সংশয়বাদের উদ্ভব হয়েছিল। পাইরো, টাইমন, আর্কেসিলস, কার্নিয়াডিস, এনিসিডেমাস, এগ্রিপা ও সেক্সটাস এম্পিরিকাস প্রমুখ দার্শনিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করতেন না। ইহুদী দার্শনিক ফিলোজুডিয়াস প্রজ্ঞা ও সংবেদন দুটোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তবে তার মতে বাহ্য চেতনার স্তর অতিক্রম করে উচ্চতর ভাবসমাধির পর্যায়ে ঐশীজ্ঞান লাভ সম্ভব। নব্যপ্লেটোবাদী প্লোটিনাস ও প্রোক্লাস প্রজ্ঞা ও সজ্ঞার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। খৃষ্টীয় দার্শনিক সেন্ট পল, সেন্ট অগাস্টিন, এরিজেনা, সেন্টআনসেলম প্রজ্ঞা'ও প্রত্যাদেশের সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। টমাস একুইনাস বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করেন। রোজার বেকনের চিন্তা ধারায়ও প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ওকাম ছিলেন স্বজ্ঞাবাদী। জনবুরিদান বুদ্ধির চেয়ে ইচ্ছার গুরুত্বের উপর বেশী জোর দেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকেরা এভাবেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী অভিমত পেশ করেছেন এবং তাদের চিন্তিত ও প্রকল্পিত পদ্ধতির উপর নিজ নিজ দর্শনের সৌধ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোন একটি পদ্ধতিও সার্বজনিন কিংবা ব্যাপক ভিত্তিক স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়নি। পাশ্চাত্যের আধুনিক যুগের দর্শনেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা হলেন-ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবণিজ, উলফ, ফিখটে, শেলিং ও হেগেল প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিক। আর অভিজ্ঞতাবাদীদের অন্যতম ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, জনলক, জর্জবার্কলে ও ডেভিড হিউম প্রমুখ। আধুনিক যুগে যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। নিকোলাস, জেকোব বোহম, বার্গসো ছিলেন স্বজ্ঞাবাদী। রুশো হৃদয়াবেগ বা অনুভূতিকে জ্ঞানের উৎস মনে করতেন। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল ফারাবী, আল গাজালী, ও ইকবাল ছিলেন স্বজ্ঞাবাদী। ইবনে রুশদ প্রজ্ঞার সমর্থক। আল কিন্দি প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। আর ইবনে সীনা ছিলেন এরিষ্টটলের ন্যায় সম্প্রত্যয়বাদী। সুফী দার্শনিকরা স্বজ্ঞা বা মরমীবাদের অনুসারী। দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে জ্ঞানের উৎস ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগত বৈপরিত্যে প্রশ্ন জাগে-জ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে কোনটি সঠিক, বুদ্ধিবাদ, না অভিজ্ঞতাবাদ ? আসলে সার্বিক সত্যের প্রশ্নে কোনটিকেই যথার্থ বলা যায় না এজন্য যে, আমাদের কাছে সার্বিক সত্য বা জ্ঞানের কোন সর্বজন স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড নেই যার

দ্বারা এর যথার্থতা বা অকাট্যতা নিরূপিত হতে পারে। সুতরাং এর স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোনটাই চূড়ান্ত বিবেচনায় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। প্রজ্ঞা কিংবা অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান নিশ্চিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সার্বিক ব্যাপারে না হলেও পৃথক পৃথক বিষয়ে হতেও পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একে সুনিশ্চিত এবং সার্বিক বলা যাবে না যেহেতু একই সত্য একজনের কাছে স্বতঃপ্রতীত হতে পারে আবার অন্যজনের কাছে নাও হতে পারে। কারণ সবার প্রজ্ঞাশক্তি সমান নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সত্য অনুভূতি ব্যক্তি সাপেক্ষ। আবার এইসত্য অনুভূতি একই ব্যক্তির কাছে সার্বক্ষণিকভাবে সত্যরূপে প্রতীত নাও হতে পারে। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্নরূপ হতে পারে। কারণ মানুষের জ্ঞানগত অবস্থা স্থিতিশীল নয়, পরিবর্তনশীল। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বিকশিত হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। আবার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতার জগত দ্বারাও প্রজ্ঞা প্রভাবিত হয়। প্রজ্ঞার স্বরূপ বিশ্লেষনে প্রতীয়মান হয়-মানবসত্তায় প্রাথমিক পর্যায়ে সূচিত সহজাত ধারণা হতে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে বিকশিত বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সংযোগ ঘটে অভিজ্ঞতা জনিত বুদ্ধির প্রবৃদ্ধির। আর এই অভিজ্ঞতাজণিত বুদ্ধির উৎপত্তি হয় দুটি প্রক্রিয়ায়, ব্যক্তিসত্তার আভ্যন্তরিণ বুদ্ধিবৃত্তির জীবনিক প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে এবং ব্যক্তিসত্তার বাইরে সাধিত লৌকিক অতিলৌকিক ঘটনা-বিষয়াবলী প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সত্তার বিবেক বোধ বিকশিত হয়ে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা বলতে এই সব উপকরণ বা উপাত্তের সমন্বিত বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাকেই বুঝায় । যা ব্যক্তিগত ভাবেও সার্বক্ষণিক নয়, তাৎক্ষণিক। এবং ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নমাত্রা বা ভিন্নধর্মী হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্যকে চূড়ান্ত সত্য না বলে 'আপেক্ষিক সত্য' রূপে বিবেচনা করাই সংগত হবে। এসব কারনেই নিছক দার্শনিক প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য তৈরী কোন জীবনাদর্শ বা জীবনদর্শন নির্ভুল, নিরপেক্ষ এবং যথার্থ কল্যাণকর বিবেচিত বা প্রমাণীত হতে পারে না। দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কার এবং মানধিক জ্ঞানের বিস্তর অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হলেও বিশ্বজনিন কোন জীবনদর্শন নির্ভুল এবং সার্বিকভাবে কল্যাণকর প্রমানীত হতে পারেনি। কার্লমার্কস-এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুললেও সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতায় একটি ভ্রান্ত মানবতা বিধ্বংসী এবং সার্বিকভাবে ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, জ্ঞান অন্বেষণ বা সত্য সাধনার পথে এমন কতকগুলো সাধারণ ও মৌলিক পয়েন্টে সার্বিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো স্বতঃসিদ্ধ রূপে চূড়ান্ত সত্যের স্বপক্ষে সম্প্রত্যয় গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই চূড়ান্ত কথা নয় বরং এগুলো সহায়ক। প্রজ্ঞা ছাড়া অভিজ্ঞতার জগত

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, আবার ইন্দ্রিয়জগত হচ্ছে প্রজ্ঞার বিচরণ ক্ষেত্র, মুলত প্রতীতি ছাড়া সম্প্রীতি শূন্য, আর সম্প্রীতি ছাড়া প্রতীতি অন্ধ। সম্প্রীতিকে যেমন উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় প্রতীতি থেকে তেমনি প্রতীতিকে আকার নিতে হয় সম্প্রীতি থেকে। চিন্তন কখনো দেখতে পায়না, আর ইন্দ্রিয় কখনও চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং এদের সংযোগ ও সমন্বয় থেকেই জ্ঞানের সম্ভাব্যতা আশা করা যেতে পারে যার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের পথ নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র অধিবিদ্যার জ্ঞান দ্বারা একটি মানবকল্যাণধর্মী জীবনদর্শন তৈরী করা সম্ভব নয়; জীবনধর্মী এবং জীবন সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় বিশেষ করে নীতি বিদ্যার জ্ঞান বা সিদ্ধান্তকে এর সাথে সমন্বিত হতে হবে। জীব বিদ্যাকেও উপেক্ষা করা যাবে না।

আত্মা, জগত ও ঈশ্বর এই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'শুদ্ধ বুদ্ধির সমীক্ষা (Critique of Pure reason)' গ্রন্থে ইশ্বরকে 'শুদ্ধবুদ্ধির অতীন্দ্রিয় আদর্শ' হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, ঈশ্বর, আত্মা ও জগত সম্পর্কে বুদ্ধি আমাদের যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা শুধু প্রতীয়মান রূপই জানি, স্বগত রূপ জানতে পারি না। কিন্তু তবুও আমরা মনে করি পরম সত্তা বলে অবশ্যই কিছু আছে, স্বগত রূপ নিয়েই আছে কিন্তু আমরা একে জানতে পারি না। কান্ট বলেন, বুদ্ধির আলোকে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না বলেই যে অন্য কোন উপায়েও ঈশ্বর, আত্মা ও স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদিকে জানা যাবে না, এমন কথা বলা যায় না। জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক যে শুধু বৌদ্ধিক তা নয়। পৃথিবী এমন একটি দৃশ্যপট যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যার সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি।

ঈশ্বর, জগত ও আত্মা-এরা একদিকে যেমন আমাদের চিন্তার নীতি, অন্যদিকে আবার আমাদের আচরণের নীতি। যে ব্যক্তি বুদ্ধি সম্মত কাজ করে, সে একই সঙ্গে এমন একটি প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হয় যে, জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে একজন ঈশ্বর আছেন, মানবাত্মা অমর ও স্বাধীন এবং এজন্যই মানুষ তার ইচ্ছা ও আচরণের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে আমরা কিভাবে আচরণ করি এবং কোথায় কখন কি ঘটছে বুদ্ধি শুধু তাই নির্দেশ করে না, কিভাবে আমাদের আচরণ করা উচিত এবং বাস্তব সত্তার স্বরুপ কি হওয়া উচিত, তা নির্দেশ করাও বুদ্ধির কাজ।

কান্টের মতে, তিনটি মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরেই বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা হিসেবে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ আবর্তিত হয়ে থাকে। প্রশ্ন তিনটি হলো ঃ আমি কী কী বিষয় জানতে পারি ? আমার কী কী কাজ করা উচিত? আমি কী আশা করতে পারি ? প্রথমটি মনের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি নীতিবিদ্যার

ব্যবহারিক দিকের ইঙ্গিতবাহী আর তৃতীয় প্রশ্নটির বিষয় একাধারে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক। যা আছে তাকে যেমন আমরা জানি, তেমনি যা হওয়া উচিত তাকে আমরা আশা করি। আবার, যা আছে তার জ্ঞান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, 'সব অস্তিত্বের একটি চূড়ান্ত ভিত্তি রয়েছে।' ঠিক তেমনি, যা হওয়া উচিত তার জ্ঞান থেকে আমরা 'সব আশা-আকাংখার একটি চূড়ান্ত যৌক্তিকতা রয়েছে'- এ রূপ সিদ্ধান্তে পরিচালিত হই।

স্বাভাবিক ভাবেই আমরা সুখ আশা করি। কিন্তু বুদ্ধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ আশাকে বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সুখ প্রাপ্তির উপযুক্ত হতে হবে। সুখের উপযুক্ত না হয়ে সুখ আশা করা নিতান্তই এক বুদ্ধি পরিপন্থী ব্যাপার। নৈতিক শর্তাবলী বলতে আমরা যা বুঝি তাই হলো সুখ লাভের প্রজ্ঞা সম্মত শর্তাবলী। অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষণ থেকে কোন প্রায়োগিক উপায়ে এসব শর্তের সন্ধান পাওয়া যায় না। এরা প্রত্যক্ষ পূর্ব। এরা নৈতিক অভিজ্ঞতা ও কর্মের পুর্ব ধারণা। প্রজ্ঞাই এদের উৎস। এদের কল্যাণেই আমরা নিজেদের নৈতিক জগতের অধিবাসী বলে দাবী করি এবং নৈতিকসত্তা বলে পরিচয় দিতে পারি।

কিন্তু নৈতিক নিয়মকে যদি বুদ্ধিসম্মত হতে হয় এবং পুরস্কারের সাথে যদি উপযুক্ততা বা সদগুণের সংযোগ থাকে, তবে জগতের একটি নৈতিক সংগঠন ও সরকার থাকা দরকার। এছাড়া, আমরা যার উপযুক্ত অর্থাৎ যা আমাদের প্রাপ্য, তা যেহেতু এ জগতে আমরা যথার্থ ভাবে পাই না, সুতরাং অন্য এমন একটি জগত থাকা অবশ্যক যেখানে উপযুক্ততার সংগে পুরস্কারের যথার্থ সংযোগ থাকবে। এ জগতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সৎ লোক তার সৎকর্মের পুরস্কার তো পায়ই না, বরং প্রায়শই দুঃখ দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করে। এতে নৈতিক নিয়মকে অর্থহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম একটি যথার্থ বিধান ও ধ্রুব সত্য। সুতরাং এ জগতে না হলেও অন্তত পরজগতে শুভ কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে কোন ব্যক্তি তার ইহলৌকিক কার্যকলাপের জন্য যেন উপযুক্ত পুরস্কার পেতে পারে, এজন্য তার আত্মাকে অবশ্যই অমর হতে হবে। সৎকর্মের সংগে পুরস্কারের এবং অসৎ কর্মের সংগে তিরস্কারের সংযোগের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব আবশ্যক। এ থেকে বুঝা যায় যে, নৈতিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে ঈশ্বর, নৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মার অমরতার ধারণা জড়িত। সুতরাং শুদ্ধবুদ্ধির আলোকে না হলেও অন্তত ব্যবহারিক বুদ্ধির তাগিদে এবং নৈতিক দিক থেকে আমরা ঈশ্বর এবং আমাদের স্বাধীন ও মৃত্যুহীন প্রকৃতির ব্যাপারে নিশ্চিতি বোধ করে থাকি।

কান্ট বলেন, নৈতিক স্বাধীনতা তাত্ত্বিক বুদ্ধির কোন নির্বিচার বচন নয়, তা ব্যবহারিক বুদ্ধির একটি স্বতঃসিদ্ধ। তাত্ত্বিক বুদ্ধির উপর ব্যবহারিক বুদ্ধির

কিছুটা প্রাধান্য আছে বলা চলে; কারণ তা তাত্ত্বিক বুদ্ধিকে এটুকু দেখাবার চেষ্টা করে যে, নৈতিক দায়িত্বের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে সব অতীন্দ্রিয় ধারণা রয়েছে, সেগুলো বুদ্ধির নীতিমালার সংগে সংগতিপূর্ণ। ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অমরত্বের প্রাজ্ঞিক ধারণার সংগে যে ব্যবহারিক প্রশ্ন জড়িত এর ফলেই তাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্টিত করা এত জরুরী হয়ে পড়ে। আর তাত্ত্বিক বুদ্ধি এদের যে সম্ভাবনার কথা বলেছে, তাই নীতি বিদ্যায় বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস দুটোই ব্যবহারিক বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে নৈতিক নিয়মের ধারণা থেকে আমরা স্বাধীনতার ধারণা পেয়ে থাকি; কিন্তু ঈশ্বর ও অমরত্ব এ দুটি ধারণার বাস্তবতার প্রমাণ আমরা পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকি পরম শুভ-এর ধারণা থেকে। বুদ্ধি আমাদের বলে যে, পরম শুভের ধারণায় সদগুণ ও সুখ-এর মিলন ঘটবে, অর্থাৎ সদগুণ ও সুখ এ দুটি নৈতিক শুভের উপকরণ। নৈতিক শুভে একদিকে থাকে সদগুণ বা নৈতিক নিয়ম অনুসারে আচরণ, অন্যদিকে থাকে স্থায়ী ও পূর্ণ সুখ। কিন্তু অভিজ্ঞতার জগতে এ দুয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সংযোগ দেখা যায় না। বরং উল্টোটাই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের নৈতিক স্বভাব দাবী করে যে, সদগুণ ও সুখ, পুরস্কার ও উপযুক্ততা-এদের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকা দরকার। যেহেতু এ জগতে তা সম্ভব হচ্ছে না, তাই এমন একটি জগত থাকা দরকার, যেখানে সদগুণ ও সুখের মধ্যে পূর্ণ সংযোগ ঘটবে। আর এর জন্যই প্রয়োজন মরণোত্তর জীবন। অর্থাৎ প্রজ্ঞার দাবী এবং নৈতিক নিয়মের বিধান অনুসারে আমাদের আত্মাকে অবশ্যই অমর হতে হবে। আর সদগুণ ও সুখের যথার্থ সংযোগের কর্তা হিসেবে থাকা চাই এমন এক অনন্ত সত্তা, প্রজ্ঞা ও শুভ গুণের অধিকারী এমন এক শক্তি, যিনি একাধারে হবেন প্রাকৃতিক জগতের স্রষ্টা ও নৈতিক জগতের শাসক। একমাত্র ঈশ্বরই প্রাকৃতিক ও নৈতিক জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে এবং শুভ আচরণ ও মঙ্গলের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। সুতরাং নৈতিক বিধাতা হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই অস্তিত্বশীল।

অধিবিদ্যার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যথার্থভাবে প্রমাণীত হতে না পারলেও অধিবিদ্যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। বরং বলিষ্ঠভাবে এর সম্ভাব্যতার কথা ঘোষণা করেছে। কারণ পরম সত্তার জ্ঞান ছাড়া আধিবিদ্যিক জ্ঞান অনিশ্চিত এবং অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরম সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও মুলত ঈশ্বরকেই পরমসত্তারূপে অভিহিত করেছেন সর্বকালের বিশিষ্ট দার্শনিকেরা। নগণ্য সংখ্যক ছাড়া বিখ্যাত দার্শনিকদের প্রায় সবাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাচীন যুগের পিথাগোরীয় দার্শনিকরা, দার্শনিক পারমেনাইডিস, এমপিডক্লিস, এনাক্সেগোরাস, মহামতি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, স্টোয়িক দার্শনিকবৃন্দ, প্লুটার্ক, ফিলোজুডিয়াস, প্লোটিনাস, প্রোক্লাস

প্রমুখ দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। হিরাক্লিটাস এবং প্রাচীন পরমানুবাদী ডিমোক্রিটাসও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। এলিয়াটিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জেনোফিনিস ঈশ্বর বলতে বুঝেছেন এক অনন্ত বিকারহীন প্রকৃতি জগতকে আর প্রোটাগোরাস(সোফিস্ট দার্শনিক)এর দার্শনিক অভিমত অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবকাশ নেই। আবার এপিকিউরাসকে নাস্তিক বলা চলে না যেহেতু তিনি দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আধুনিক যুগের দার্শনিক ব্রুনো, কাম্পানেল্লা, লুথার, ক্যালভিন, জেকোব বোহম, হবস, ডেকার্ট, লাইবনিজ, জন লক, বার্কলে, বাটলার, ভলতেয়ার, রুশো, কান্ট, ফিখটে, শেলিঙ ও হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষেই তাদের অভিমত পেশ করেছেন। কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বিখ্যাত এসব দার্শনিকদের কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। দার্শনিক স্পিনোজা পরম পদার্থকে ঈশ্বর বলেছেন এজন্য তাকে আস্তিক্যবাদী বলা চলে না। ডেভিড হিউম নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। দিদেরো নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আর কার্লমার্কস ছিলেন জড়বাদী। সুতরাং এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না বরং মনেপ্রাণে নাস্তিক ছিলেন। সংখ্যায় এরা খুবই নগণ্য (প্রাচীণ যুগ থেকে আধুনিক যুগের হেগেল মার্কস পর্যন্ত); উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট। আর মুসলিম দার্শনিকদের সবাই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। মোটকথা আল্লাহ বা ঈশ্বরের ধারণাটি সমগ্র জগৎব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ধারনা। ধারণাকে শুধু মাত্র তখনই প্রত্যাখ্যান করা যাবে যখন তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা মিথ্যা প্রমানীত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সত্য বলেই স্বীকৃত- হবে। ঈশ্বর বা আল্লাহর ধারণাটি এরকমেরই সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তব সত্য ধারণা যা আজ অবধি মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। এজন্যই জগৎ বিখ্যাত সংখ্যাগুরু দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। অতএব ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রশ্নে মুক্তবুদ্ধির আলোকে বলা যায় ইশ্বর বা আল্লাহ অস্তিত্বশীল পরমসত্তা।

নৈতিকতা একটি জীবন দর্শনের অনিবার্য বিবেচ্য বিষয়। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন বা জীবনাদর্শ চিন্তাও করা যায় না। বলা হয়ে থাকে নৈতিকতার উৎস বিবেক। বিবেক যা ভাল বলে তা-ই ভাল, যা মন্দ বলে তা-ই মন্দ। কিন্তু বিবেক বোধ সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয় না, একই পরিমাণের হয় না। ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। যেহেতু একই রকম বা একই মাত্রার হয় না সেহেতু ভাল ও মন্দ প্রশ্নে সবার দৃষ্টি ভঙ্গি সমান হতে পারেনা। সেজন্য চূড়ান্ত বিবেচনায় মানুষের বিবেক নৈতিকতার মাপকাঠি হতে পারে না। এজন্য এমন একটি সত্তা আবশ্যক যে সত্তা প্রতিটি মানুষে প্রাথমিকভাবে ভিত্তি স্থাপিত সহজাত ধারণা রূপ বিবেক বোধের স্বরূপ, মাত্রা বা পরিমান এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত

ও সমৃদ্ধ বিবেকবোধের তাৎক্ষণিক মাত্রা বা পরিমান সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবগত এবং এ বিবেক বোধের আলোকে ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রয়োগে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তি দ্বারা সাধিত প্রতিটি কর্মের ফলাফল প্রদানে সক্ষম। এ রকম একটি সত্তার পক্ষেই সম্ভব প্রাথমিক পর্যায়ের বিবেক বোধ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিবেক বোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সাধারণ সূত্রের মাধ্যমে মানবতার উপযোগী একটি সার্বজনিন নীতি দর্শন বা নৈতিক জীবনাদর্শ পেশ করা। সুতরাং ঈশ্বর বা আল্লাহ প্রদত্ত মানদন্ডই নৈতিকতার পরম মানদন্ড রূপে বিবেচিত হতে পারে। আবার আল্লাহ হচ্ছেন নৈতিক বিধাতা সুতরাং নৈতিকতার স্বরূপ ও মানদন্ডের ব্যাপারে তো তিনিই সর্বজ্ঞ।

এখন আসা যাক, নৈতিকতার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। মানুষ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট। আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এ গুলোর মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ফলে মানুষ সুখ লাভ করে। এটা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি গত কারণেই মানুষ অধিকতর সুখ পেতে চায়। বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির এই বাড়তি চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগতি স্থাপন করে। এভাবে যে সুখ লাভ হয় তাই হচ্ছে শান্তি। সুখ ও শান্তি ব্যক্তিগত অনুভূতি সাপেক্ষ। সুতরাং তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। মানুষ সুখ চায়, শান্তি চায় বেশী করেই চায়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মুক্তি ও কল্যাণ কিংবা আবেগ অনুভুতি সম্পৃক্ত সুখ ও শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত কিংবা স্বীকৃত অধিকারের সীমানায় আপন স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস- যা অন্যের অধিকার বা স্বার্থ ক্ষুন্ন করেনা, অন্যের জন্য অশান্তি বা দুঃখজনক নয়, এমন কাজ অবশ্যই অনৈতিক হওয়ার যৌক্তিকতা রাখেনা। এটা নৈতিক কাজ রূপেই বিবেচিত। যেমন ধর্ষণের মাধ্যমে যৌন-সুখ সম্ভোগ একটি অনৈতিক কাজ কিন্তু স্ত্রীর সাথে সচ্ছন্দ যথেচ্ছ সহবাস অবশ্যই নৈতিক কাজ। সুতরাং স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকলেই কাজটি অনৈতিক হবে এমন ধারণা সঠিক নয়। প্রজ্ঞাবান মানুষ ক্ষনস্থায়ী সুখ-শান্তির চেয়ে দীর্ঘ স্থায়ী বা চিরস্থায়ী সুখ শান্তিকে কামনা করে এবং সে অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণে সে সচেষ্ট থাকে। এটাও তার একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আভ্যন্তরিন সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। সুতরাং কেউ যদি পরকালীন সীমাহীন সুখ-শান্তির আশায় কিংবা ভয়াবহ শাস্তির আশংকায় স্বেচ্ছায় ইহজগতে অতিরিক্ত কিংবা মাত্রাতিরিক্ত সুখ ভোগের পথ পরিত্যাগ করে নৈতিক আচরণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর প্রেক্ষিত নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে তবে এটাকে 'বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া বাধ্যতাবোধ' বলার এবং এ হিসেবে এটাকে 'যথার্থ নৈতিকতা নয়' বলার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? অবশ্যই নেই। কেননা এটা তার আভ্যন্তরিণ বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের ফসল। ব্যক্তি তার ইচ্ছার স্বাধীনতার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমেই এ পথ বেছে নিয়েছে। ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তির সীমালংঘন-কামনাকে সে তার আপন বুদ্ধিবৃত্তির

প্রয়োগে সীমিত করেছে, সংযত করেছে। এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া, নৈতিক আচরণের যথোপোযুক্ত ফলাফল ভোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না-ই থাকে তবে একজন ব্যক্তি সত্তা কেনইবা নৈতিক আচরণ করবে? পরকালীণ পুরস্কারের ব্যবস্থাপনা ছাড়া পৃথিবীতে কোন যথার্থ ব্যবস্থা আছে কি? নেই। সুতরাং নৈতিকতা সংরক্ষণে ইহ ও পরকালীন পুরস্কারের প্রত্যাশা এবং শাস্তির ভীতি আবশ্যিক উপাদান। পুরষ্কারের আশা নৈতিক আচরণে প্রেরণা যোগায়, উদ্বুদ্ধ করে আর শাস্তির ভীতিজনিত আশংকা অনৈতিকতাকে নিরুৎসাহিত করে। মানুষ তার প্রাজ্ঞিক সিদ্ধান্তেই তা অর্জন করে। বলা হয় মানুষ বিবেকের তাগিদেই নৈতিক আচরণ করে। কিন্তু বিবেক কেন এরকম তাগিদ দেয়? কার নির্দেশে? নাকি বিবেক স্বয়ংক্রিয়? অব্যশই না। তাহলে বিবেকের উৎস কোথায়? মননধর্মী পরমসত্তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়কি? যায় না। সেই পরম উৎসে ফিরে যেতে হবে, সকল আচরণ লিপিবদ্ধ হচ্ছে জবাবদিহী করতেই হবে, বিন্দু পরিমাণ কাজও বাদ যাবে না এই অনুভূতিই একজন মানুষকে যথার্থভাবে নৈতিক করতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিকতাই যথার্থ নৈতিকতা। মানুষ ও প্রকৃতির স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত এ নৈতিকতা মানব বৈশিষ্ট ও প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যশীল, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ। এ নৈতিকতা ভিত্তিক আদর্শিক জীবন পদ্ধতি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ও প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর এর পরিপূর্ণ বিশ্বজনিন ও কালজয়ী রূপ হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা–

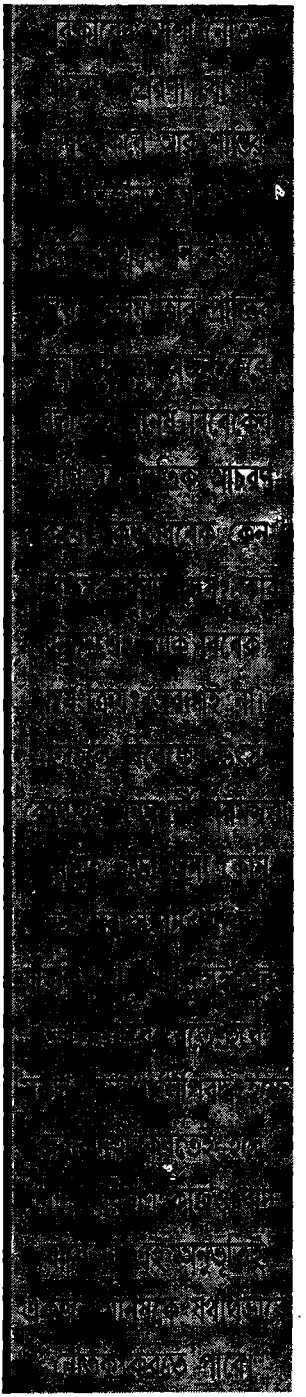

যার প্রামাণিকতা অকাট্য এবং বাস্তবতা ঐতিহাসিক। সুতরাং বিশ্বব্যাপী জড়বাদী জীবনব্যবস্থার ঐতিহাসিক ব্যর্থতা ও মানবতা বিধ্বংসী দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পর, সার্বিক বিবেচনায় মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে এক ও পরম সত্তা আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব ও শাসনের স্বীকৃতি এবং নিঃশর্ত আনুগত্যের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ঐক্য, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা তথা মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধানের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। এটাই হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির দাবী, শুভ বুদ্ধির আদর্শ। প্রকৃত জীবন দর্শন। ১২/০২/৯৭ ঈসায়ী

ধর্ম ও দর্শন ঃ সমন্বয় ও সম্ভাবনা

আধুনিক দর্শনে ধর্ম ও দর্শনকে পরস্পর বিরোধী বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে একই পরম সত্যের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দুটি দৃষ্টিভঙ্গির দুটিই সত্য হতে পারেনা। একটি সত্য এবং অপরটি অনিবার্যভাবেই মিথ্যা। এখন সত্য যেহেতু এক,দুই হতে পারেনা, আবার ধর্ম ও দর্শন যেহেতু পরস্পর বিপরীতধর্মী তাহলে একই সত্য উপলব্ধিতে পদ্ধতিগতভাবে কোনটি সঠিক, দর্শন না ধর্ম ? যদি দার্শনিক পদ্ধতি সঠিক ধরা হয় তবে ধর্ম মিথ্যা, যদি ধর্মীয় পদ্ধতিকে সঠিক বিবেচনা করা হয় তাহলে স্বাধীন জ্ঞান চর্চা বা দর্শন অপ্রয়োজনীয় বা মিথ্যা। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয় অর্থাৎ দর্শন ও ধর্মকে পরস্পর বিরোধী ভাবা না হয় তবে উভয় পদ্ধতিগত ভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ে একই সত্যের উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে যদি পদ্ধতি গুলি দুটিই পৃথক ভাবে ত্রুটিহীন থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দার্শনিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক পদ্ধতি যার প্রয়োগে সুনিশ্চিত ভাবে পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ? বুদ্ধি না অভিজ্ঞতা ? স্বজ্ঞা না সম্প্রত্যয় ? কোনটিই না । কারণ কোনটাই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তাহলে দার্শনিক জ্ঞান লব্ধ সত্যকে পরম সত্য বিবেচনা করার পথ কোথায় ? প্রাপ্ত সত্যের সত্যতা নিরূপন করার মাপকাঠি বা মানদন্ড তাহলে কি হতে পারে ? যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ কোন মানদন্ড নেই সুতরাং এক্ষেত্রে প্রত্যয়গত ধারণার আলোকেই এর যথার্থতা বিচার করা যেতে পারে। দার্শনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সত্য (সম্ভাব্য) যদি প্রত্যয় গত ধারনার সাথে সংহতি প্রকাশ করে তবে উভয়টির সম্পৃক্ততায় সমৃদ্ধ একটি সংবদ্ধ প্রত্যয়ী সত্যের মডেল বা আদর্শ পাওয়া যেতে পারে যা প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক সত্যের স্বীকৃতি লাভ করবে।

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশদ (যিনি পাশ্চাত্যে

এভেরুশ নামে সুপ্রসিদ্ধ) বলেন- " পদ্ধতি গত ভিন্নতা থাকলেও ধর্ম ও দর্শনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ধর্ম ও দর্শনে কোন বিরোধ নেই বরং একে অপরের সম্পুরক। প্রজ্ঞার কাজ হচ্ছে আদি সত্তাকে জানা আর ধর্মেরও কাজ হচ্ছে আল্লাহরূপ আদি সত্তাকে জানা এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা। অতএব প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ বা দর্শন ও ধর্ম একই সত্তাকে জানার কাজেই নিয়োজিত। " সুতরাং বলা যায় সঠিক দার্শনিক জ্ঞান ও প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভিন্নরূপ হতে পারে না বরং চূড়ান্ত অর্থে একই সত্য অনুভূতির প্রকাশ ঘটাবে অর্থাৎ প্রজ্ঞার 'আদি সত্তা' আর প্রত্যাদেশের 'আল্লাহ' যদি এক ও অভিন্ন সত্তা হয়ে থাকে তবে প্রজ্ঞায় প্রাপ্ত জ্ঞান প্রত্যাদেশের যথার্থতা ও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করবে আর প্রত্যাদেশ প্রজ্ঞায় প্রাপ্ত জ্ঞানের সত্যতা নিরুপন করবে। মোট কথা প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ সদৃশ হবে। অতএব, ধর্ম যেমন নির্বিচারে গৃহীত হতে পারেনা। তেমনি দর্শনও সত্য ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেনা। এরা পরস্পর বিরোধী নয় বরং সম্পুরক। ধর্মের যথার্থতা ও আবশ্যিকতা সৃষ্টি হয় প্রজ্ঞার সার্বিক বিবেচনায় আর পৃথকভাবে প্রতিটি প্রাজ্ঞিক সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরুপিত হয় প্রত্যাদেশের সাদৃশ্যতায়।

প্রকৃত জীবন থেকে বিচিছন্ন দর্শনকে প্রকৃত দর্শন বলা যায় না। দর্শন শুধু আধিবিদ্যিক জ্ঞান চর্চা বা তত্ত্বানুসন্ধান নয়, বরং উন্নততর জীবন এবং সে জীবন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের দাবীর বাস্তব প্রকাশ। দর্শনের কাজ শুধু বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে জগৎকে জানা ও ব্যাখ্যা করাই নয়, বরং শান্তি ও সংহতিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একে ব্যবহার করা। ব্রড-এর ভাষায় ঃ " দর্শনের কাজ হলো বিভিন্ন বিজ্ঞানের ফলাফল সংগ্রহ করা, তাদের সংগে ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতার ফলাফল যুক্ত করা এবং এরপর জগতের স্বরূপ ও তাতে আমাদের অবস্থান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সমগ্র সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা।" অর্থাৎ যথার্থ দর্শন মানেই জ্ঞানের একত্ববিধান বা সমন্বয় সাধন। যা পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের প্রায়োগিক কাঠামো তৈরী করে। সোজা কথায় দর্শন হচ্ছে জীবন ও জগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা ও অনুশীলন। এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার জন্য কল্যানকর জীবনাদর্শের দিক নির্দেশনা দেয়া। সুতরাং জীবন ঘনিষ্ট প্রতিটি বিষয়ই এর ' বিবেচ্য বিষয়' হিসেবে স্বীকৃত হতে বাধ্য।

ধর্ম মানুষের জীবন পদ্ধতি। প্রকৃত ধর্মের আনুগত্য, বিভ্রান্তি, বিকৃতি কিংবা অন্ধ অনুসরন যেভাবেই হোক ধর্ম মানবতার সাথে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পৃক্ত একটি বোধ, একেকটি ব্যবস্থা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এর আবশ্যিকতা একটা বাস্তব বিষয়। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও এর আবেদন হ্রাস পায়নি বরং প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান ও আনুগত্যের অনুভব বেড়েই চলেছে। পৃথিবীতে ধর্ম বিচ্ছিন্ন কোন জাতির ইতিহাস নেই। ধর্মীয় অনুভুতি মানুষের একটি মৌল অনুভূতি। বস্তুবাদী

সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাস্তিক্যবাদী সরকার কর্তৃক ধর্মের বিরুদ্ধে চরমপন্থা গৃহীত হলেও একে দাবিয়ে রাখা যায়নি বরং ধর্মীয় অনুভূতি আরো চাঙ্গা হয়েছে, সংহত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় তো রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছে। অথচ এই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার মসজিদকে সিনেমা হল আর বস্তুবাদী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মকে নির্মুল করা যায়নি। সোভিয়েট সাম্রাজ্যের পতন ধর্মীয় সংহতির একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। অস্বীকারের উপায় নেই। এটাকে নিছক পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করার কোন অবকাশ ও যৌক্তিকতা নেই। ধর্ম জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। অতএব, ধর্মকে বাদ দিয়ে নয় বরং এর যথার্থ সমন্বয়েই প্রকৃত জীবন দর্শন সৃষ্টি হতে পারে। এটা প্রজ্ঞার দাবী, ব্যবহারিক বুদ্ধির সমীক্ষার সিদ্ধান্ত। প্রকৃত জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ধর্মের নামে অন্যায় নিয়ন্ত্রণ ও অবিচার যেমন কাম্য হতে পারে না ঠিক তেমনি ধর্মের প্রতি নির্বিচার, অন্ধ বিদ্বেষ বা আক্রোশ প্রকৃত দর্শন চর্চার পরিচায়ক হতে পারে না।

এখন আসা যাক, সত্য বা প্রকৃত ধর্মের যথার্থতা বিবেচনা প্রসঙ্গে। বিবদমান প্রতিটি ধর্মই যে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সত্য, অকাট্য তা বলা যায় না। ধর্মীয় বিধি বিধানের সঠিক ও নির্ভর যোগ্য সংরক্ষনের অভাবে ঐশী ধর্ম গুলো মানুষের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, স্বার্থপরতার ক্রীড়নক হয়েছে - এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং নিছক বিশ্বাস বা অন্ধ আনুগত্য ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। প্রজ্ঞার আলোকেই ধর্মের যথার্থতা, অকাট্যতা ও আবশ্যিকতা বিবেচিত হতে পারে। অতএব স্বাধীন প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে ধর্মকে বিশ্লেষন করা যায়, যৌক্তিকতা ও আবশ্যিকতা নিরূপিত হয় অর্থাৎ সর্বোপরি যে ধর্ম প্রজ্ঞার দাবীকে অস্বীকার করে না এবং প্রজ্ঞা বা দর্শনের সাথে সমন্বিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে ধর্মই প্রকৃত সত্য ধর্ম হওয়ার দাবী করতে পারে। আবার যে ধর্ম কল্পকাহিনী বা অলৌকিক বিষয়াবলী নির্ভর, বাস্তব জীবনের সাথে যার সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে, অর্থহীন

নিছক বিশ্বাস বা অন্ধ আনুগত্য ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। প্রজ্ঞার আলোকেই ধর্মের যথার্থতা, অকাট্যতা ও আবশ্যিকতা বিবেচিত হতে পারে। অতএব স্বাধীন প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে ধর্মকে বিশ্লেষন করা যায়, যৌক্তিকতা ও আবশ্যিকতা নিরূপিত হয় অর্থাৎ সর্বোপরি যে ধর্ম প্রজ্ঞার দাবীকে অস্বীকার করে না এবং প্রজ্ঞা বা দর্শনের সাথে সমন্বিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে ধর্মই প্রকৃত সত্য ধর্ম হওয়ার দাবী করতে পারে। আবার যে ধর্ম কল্পকাহিনী বা অলৌকিক বিষয়াবলী নির্ভর, বাস্তব জীবনের সাথে যার সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে, অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা যার পদ্ধতি, অন্ধ বিশ্বাস আর অযৌক্তিক আনুগত্য যার ভিত্তি

আনুষ্ঠানিকতা যার পদ্ধতি, অন্ধ বিশ্বাস আর অযৌক্তিক আনুগত্য যার ভিত্তি মোট কথা, যুক্তি ও দর্শন তথা প্রজ্ঞা দ্বারা যাকে ব্যখ্যা করা যায় না, সেই ধর্মকে কোনভাবেই প্রকৃত ধর্ম বলা যায়না। প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে ধর্ম সে ধর্ম অবশ্যই সত্যধর্ম হতে পারে না। কারন পরম সত্তা আল্লাহ মানুষকে প্রজ্ঞাশক্তি বা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। সুতরাং ঐশী প্রত্যাদেশ অবশ্যই প্রজ্ঞার পরিপন্থী হতে পারে না।

মোট কথা, যুক্তি ও দর্শন তথা প্রজ্ঞা দ্বারা যাকে ব্যখ্যা করা যায় না, সেই ধর্মকে কোনভাবেই প্রকৃত ধর্ম বলা যায়না। প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে ধর্ম সে ধর্ম অবশ্যই সত্যধর্ম হতে পারে না।

অতএব যে ধর্ম প্রজ্ঞার দাবী পূরণ করতে পারে না সে ধর্মের আনুগত্য দাবীর কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারেনা।

ইসলামই হচ্ছে এ রকম একমাত্র ধর্ম যা নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। যার প্রতিটি বক্তব্য বিষয় প্রাজ্ঞিক। প্রজ্ঞার পরিপন্থি কোন অযৌক্তিক আনুগত্য ইসলাম দাবী করে না। স্বাধীন জ্ঞান চর্চাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। জীবন ও জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের যৌক্তিকতা সার্থকভাবে প্রতিপন্ন করেছে। কুরআন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রকৃতিকে জানা মানুষের কর্তব্য বলে ঘোষনা দেয় । মহানবীর হাদীস অনুযায়ী ' অল্লাহ সর্ব প্রথম যে জিনিসটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে জ্ঞান' । জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন মানুষের কর্তব্য। প্রকৃতির কাছে অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করা নয়, বরং মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতির শক্তি সমূহকে কাজে লাগানোর জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষকে প্রজ্ঞা ও কান্ডজ্ঞান (Common Sense) ব্যবহারের কথা বলে। জ্ঞানের সন্ধানে যিনি গৃহত্যাগ করেন প্রকৃত পক্ষে তিনি আল্লাহর পথেই অগ্রসর হোন। ইসলাম ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। উদার ও মানবিক। কুরআন যেমন অযৌক্তিক ধর্মের নিন্দা করেছে তেমনি আবার শ্রদ্ধাশীল ছিল প্রাচীন ধর্ম সমূহের মৌল শিক্ষার প্রতি। ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেনা। সমগ্র বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম একাধারে আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক। ইসলাম দুনিয়া বিমুখ সন্ন্যাসবাদী নয় বরং দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যানের মাধ্যমেই পরকালীন সাফল্যের কথা বলে।ইসলাম মধ্যপন্থী ভারসাম্য পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানবীয় কামনা-বাসনা তথা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অস্বীকার করেনা বরং নৈতিকতার সাথে সমন্বিত করে। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বক্তব্য পরিস্কার এবং মানবকল্যাণধর্মী। জীবনের কোন একটি দিকও ইসলামের নির্দেশনার বাইরে নয়। সুতরাং ইসলামই

হচ্ছে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যার ভিত্তি দার্শনিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বা সত্যধর্ম হিসেবে দর্শনের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই বরং সংগতিপূর্ণ।

সবশেষে যে কথাটি বলতে হয়, মধ্যযুগের দর্শন চর্চায় ধর্মীয় অন্যায় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী ছিল খৃষ্টীয় চার্চ কর্তৃপক্ষ। যা থেকে দর্শন চর্চায় সূচনা হয়েছিল ধর্ম বিরোধী মানসিকতা - যা বিদ্বেষ থেকে বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে গড়িয়েছে। পাশ্চাত্যে ধর্ম ও দর্শনের এই সংঘাতের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং চার্চের অপরাধের খেসারত অন্যধর্ম বিশেষ করে ইসলামের উপর কোন যুক্তিতে আরোপিত হতে পারে ? পারে না। এটা প্রজ্ঞার দাবী নয়। সেজন্য চার্চের অপরাধের কারনে সাধারনভাবে সকল ধর্মকে দর্শনের বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করা অবশ্যই প্রকৃত দর্শন চর্চার ফলশ্রুতি নয়। এর পরিনতিও ভয়াবহ। ইতিহাস স্বাক্ষী জড়বাদী আদর্শের উত্থান মানবতাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। ভোগবাদকে উসকে দেয়া হচ্ছে আর নৈতিকতা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনি দুঃখজনক এবং আশংকাজনক অবস্থা থেকে অবমুক্তির জন্য প্রকৃত ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের কোন বিকল্প নেই। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন যুগে যখন ছিলনা ধর্মের কোন সুসংবদ্ধরূপ, বহু অলীক দেব দেবীর বিশ্বাস, অন্ধ আনুগত্য, পূজা-অর্চনার নামে অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতাই ছিল ধর্মীয় আচার, তখনকার বিখ্যাত দার্শনিকরাও এখনকার মত ধর্মের ক্ষেত্রে নির্বিচারবাদী ছিলেন না। প্রচলিত ধর্মীয় মত ও কুসংস্কারের অযৌক্তিকতা-অসারতা তুলে ধরেছেন, বিরোধীতা করেছেন ঠিকই কিন্তু প্রকৃত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা সত্যধর্মের যথার্থতার বিরোধীতা করেননি বরং উৎসাহিত করেছেন। মহামতি সক্রেটিস মনে প্রানে একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী ধার্মিক ছিলেন যিনি প্রচলিত ধর্মের বিরোধীতা করেও সত্য ধর্মের জয়গান গেয়েছেন মৃত্যুর পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত। প্লেটো যখন তাঁর প্রকল্পিত আদর্শরাষ্ট্রের বাস্তবতায় ব্যর্থ হলেন তখন তিনি তাঁর 'লজ' গ্রন্থে ঈশ্বর তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বললেন। সুতরাং ধর্ম ও দর্শনের বিরোধ নয় বরং আগামী দিনের পৃথিবীকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য প্রকৃত ধর্মও দর্শনের সমন্বয় হোক আজকের অঙ্গীকার।

ইচ্ছার স্বাধীনতা ও নৈতিক কাজের ফলাফল

মানব সত্তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নীতি বিজ্ঞানে স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। কারন মানব সত্তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টা অ-স্বীকার্য হলে নৈতিকতা-অনৈতিকতা এবং এর প্রেক্ষিত ফলাফল তথা পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান নিরর্থক হয়ে যায়। মানবসত্তা যদি পশুচারনিক হয়ে পড়ে তবে গোটা সভ্যতার ইমারত ধ্বসে পড়বে। লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার বিধ্বংসী প্রক্রিয়ায় বিশ্বমানবিক সভ্যতা হয়ে পড়বে অব্যাহত ভাবেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বংসাত্মক। মানুষ নৈতিক জীব; নৈতিকতাই তার মৌলিক উপাদান - মানবতার অপরিহার্য শর্ত। ব্যক্তিক নৈতিকতার ক্রমাবনতি ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও বিশ্ব সমাজকে অনৈতিক তথা সর্বপ্লাবী ধ্বংসকামী করে তোলে। নৈতিকতা - অনৈতিকতার এ প্রশ্নে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য এবং এ স্বাতন্ত্র্য বোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কর্ম-প্রচেষ্টাই মূলত কার্যতঃ ক্রিয়াশীল। একটি ব্যক্তিসত্তা যদি স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ তথা স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ায় জীবনিক কর্মধারা চালিয়ে যেতে সক্ষম না হয় কিংবা সাধিত সেই কর্মের সংঘটক ইচ্ছাশক্তি যদি স্বকীয় মানসিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নিজস্ব ইখতিয়ারে সৃষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে সম্পন্ন প্রতিটি কাজ এবং কাজ সৃষ্টির কারন ইচ্ছাশক্তির জন্য ব্যক্তিসত্তাকে দায়ী করা অযৌক্তিক। আর সেজন্যই নৈতিকতার রক্ষাকবচ হিসেবে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতাকে নীতি বিজ্ঞানে স্বীকার্য সত্য ও বিবেচিত বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো - ইচ্ছার এই স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা কি নিরঙ্কুশ? অর্থাৎ ইচ্ছার এ বিষয়টি কি সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যক্তিসত্তার একতরফা ইখতিয়ারাধীন? কোনভাবেই কি ব্যক্তিসত্তায় ইচ্ছা সৃষ্টিতে কোন শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই ? অন্যদিকে ব্যক্তি সত্তায় সৃষ্ট ইচ্ছার ফলশ্রুতিতে সংঘটিতব্য কাজ কি নিরঙ্কুশ ভাবেই ইচ্ছার সার্থক প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম ? সংঘটিত প্রতিটি কাজ কি সার্বক্ষনিকভাবেই ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছার অনুরূপ হয়ে থাকে? ইচ্ছার বিপরীত কোন কাজ কি সম্পাদিত হয় না? যদি না হয় তবে ব্যর্থতা আর হতাশার অস্তিত্ব কোথায় ? যৌক্তিক জবাব হচ্ছে - ব্যক্তিক ইচ্ছা সার্বক্ষনিকভাবেই স্থিতিশীল ও প্যারালাল নয় বরং ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ইচ্ছা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয় । ' কার্যকারণ ' নিয়মের সাথেও এ জবাবটি সংগতিপূর্ণ। আবার সংঘটিত একটি কাজের জন্য ব্যক্তিসত্তাকে সার্বিকভাবেই দায়ী করা চলেনা যেহেতু প্রকৃতি পরিবেশ - পরিস্থিতিগত কারনে সংশ্লিষ্ট সেই সত্তা তার কর্মের স্বাধীনতাকে সার্বক্ষনিকভাবে সার্থক প্রয়োগে সক্ষম হয়না। প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা যদি 'ইচ্ছার'-

র স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ইচ্ছার সার্থক বাস্তবায়নের অভাবেই কি ব্যক্তিক সেই ইচ্ছা অ-মূল্যায়িত থেকে যাবে কিংবা অবমূল্যায়িত হবে? সেই ইচ্ছার নৈতিক 'মান' নির্ণায়ক কিংবা 'পরিমাণ' পরিমাপক যন্ত্র কোথায় ? সাক্ষাত মৃত্যুভীতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত একটি দুষ্কর্মের জন্য একটি সত্তাকে কি আমরা দায়ী করতে পারি? পারলে কতটুকু? সাক্ষ্য প্রমানে জাগতিক বিচার ব্যবস্থায় আদালতে যদি তার চরম শাস্তি তথা মৃত্যুদন্ড হয়ে যায় তাহলে কি এটাকে ন্যায়বিচার বলা যাবে ? পুরো ব্যাপারটিতে সে কি তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছে ? কর্মের স্বাধীনতা কি সে ভোগ করেছে ? তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের সাথে বাস্তব কর্ম-প্রয়োগ কি সাংঘর্ষিক নয় ? কথিত ন্যায় বিচারে সংঘটিত কাজের নৈতিক 'মান' কি নির্ণীত হয়েছে? নৈতিক পরিমান কি নির্ধারিত হয়েছে? নৈতিক কাজের ফলাফল তথা প্রকৃত 'পরিণাম' অর্থাৎ যথোপযুক্ত পুরস্কার বা শাস্তি কি সে সঠিকভাবে ভোগ করতে পেরেছে ? 'প্রতিটি সত্তাই তার নৈতিক কাজের পরিণাম ভোগ করবে'। - নীতি বিজ্ঞানের এ স্বতঃসিদ্ধ কথাটির নিরপেক্ষ ও যথার্থ প্রয়োগ কি জাগতিক বিচারে পূর্নমাত্রায় সম্ভব? জবাব প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী অর্থাৎ ইচ্ছা সার্বক্ষনিক ভাবেই তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম নয় এবং সংঘটিত প্রতিটি কাজও সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছার অনুরূপ নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তথা প্রকৃতি-পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারনে এগুলোর ব্যতিক্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়। ফলে ব্যক্তিসত্তার দ্বারা সম্পাদিত কাজের যথার্থ নৈতিক 'মান' ও 'পরিমান' নির্ণয় ও নির্ধারন সম্ভব নয়। এরই প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য - যেহেতু কর্ম সম্পাদনকারী তথা কর্ম-সংঘঠক সত্তাটির কাজের নৈতিক 'মান' ও 'পরিমান' নির্ধারন করা সম্ভব নয় সেহেতু সংশ্লিষ্ট সেই সত্তাটির উপর যথার্থ নৈতিক ফলাফল তথা পুরস্কার প্রদান কিংবা শাস্তি প্রয়োগও সম্ভব নয়।

'ইচ্ছার স্বাধীনতা' সমস্যাটি ইসলামের তাকদীর প্রাসঙ্গিক আলোচনার অপরিহার্য বিষয়। শাব্দিক অর্থে তাকদীর মানে 'পরিমান নির্ধারন' আর পারিভাষিক অর্থে এর মানে হচ্ছে অদৃষ্ট তথা ভাগ্যে বিশ্বাস। পরমসত্তা আল্লাহ আল কুরআনে ঘোষনা করেছেন যে, তিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাকদীরের বিধান দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সবকিছু তাকদীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরমসত্তার এই ঘোষনার প্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাকদীর - এর বিধান কি এবং 'ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা'- দার্শনিক এ সমস্যাটির ব্যাপারে তাকদীর তত্ত্ব কি বক্তব্য পেশ করে। পরম সত্তা কর্তৃক যা কিছুই পূর্ব নির্ধারিত তা-ই হচ্ছে তাকদীর। যেহেতু বিশ্বজগত পরমসত্তার পূর্ব পরিকল্পিত ও বিধিবদ্ধ তাই সংগত কারনেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিই তাকদীরের বিধান। বিশ্বজগতে এ বিধান দুটি প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ লাভ করে।

প্রক্রিয়া দুটো ভিন্ন দুটি নিয়ম বা আইনগত পদ্ধতিতে কার্যকর হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে পরমসত্তার ইখতিয়ারাধীন 'সৃষ্টিগত আইন' যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'তাকবীনী' আইন বলে। এ প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে চূড়ান্ত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটি একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি যার উপর মানবসত্তার কোন প্রভাব নেই অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনা। এ প্রক্রিয়াটি পরমসত্তার একান্ত স্বকীয় ইচ্ছাধীন। তাঁর সৃষ্ট সত্তার ইচ্ছাশক্তি এক্ষেত্রে অকার্যকর। ফলে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি সত্তাই এক্ষেত্রে জবাবদিহীর আওতামুক্ত অর্থাৎ নৈতিকতার বাঁধনমুক্ত। যেহেতু তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা এক্ষেত্রে অস্বীকৃত এবং অপ্রায়োগিক সেহেতু তাকবীনী আইনের বাধ্যবাধকতায় সে নৈতিক দায়মুক্ত। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় মানবসত্তার আপাতঃ প্রভাব পরিদৃশ্য হলেও মৌলিক পরিবর্তন মানবসত্তার সাধ্যাতীত। আপাতঃ দৃশ্যত স্বল্পমেয়াদী এ ক্রিয়াশীল প্রভাব মূলতঃ পরমসত্তা কর্তৃক তাৎক্ষনিক প্রদত্ত 'অস্থায়ী ক্রিয়াশীল অবকাশ'। আর এ 'ক্রিয়াশীল অবকাশ' অবশ্যই জবাবদিহীমূলক। যেহেতু এটি মানবসত্তার স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ায় চলে আসে সেহেতু এটি তাকবীনী আইনে ধর্তব্য হয়না। অপর প্রক্রিয়াটি হলো মানবসত্তার ইখতিয়ারাধীন বাস্তব জীবনযাপনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাভিত্তিক কাজ যাকে ইসলামী পরিভাষায় তাশরিয়া আইন বলে। এক্ষেত্রে মানবসত্তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং প্রায়োগিক। স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মভিত্তিক হওয়ার প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে মানবসত্তা তার কৃতকর্ম ও কর্ম-প্রেরণাদায়ক ইচ্ছাশক্তির জন্য সার্বিকভাবে নৈতিক দায়বদ্ধ। অর্থাৎ এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ জবাবদিহীমূলক : নৈতিকতা - অনৈতিকতার প্রশ্ন সাপেক্ষ। এ প্রক্রিয়াতেই মানবসত্তার নৈতিক কাজের 'মান' ও 'পরিমান' নির্ধারিত হয় এবং এ পরিমানের সমানুপাতিক হারেই ফলাফল প্রদান করা হয়। এ ফলাফল ইহকাল ও পরকালে আংশিক কিংবা পূর্ণভাবে প্রদত্ত হয় অর্থাৎ একটি নৈতিক কাজের পূর্ণ ফলাফল ইহকাল ও পরকালের যে কোন একটি অথবা উভয়কাল মিলে পূর্ণতা লাভ করবে। মানবসত্তার স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়াভূক্ত কাজটির বাস্তবায়ন আদৌ হবে কি হবেনা সর্বদ্রষ্টা পরমসত্তা তা সার্বিকভাবেই অবজ্ঞাত এবং এ প্রক্রিয়াটির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত বিশেষ সত্তার ফেরেশতারাও অবগত। অসংঘটিত কাজের ফলাফল ঝুলন্ত বা অচূড়ান্ত অবস্থায় একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় 'ভাগ্যলিপি'-তে লিপিবদ্ধ থাকে। তাকদীরের এই ব্যবস্থাপনাকে তাকদীরে মুয়াল্লাক বলে। মুয়াল্লাকে সিদ্ধান্তহীন বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতাকে সে কিভাবে প্রয়োগ করবে তথা তার নৈতিক কাজটি কিরূপ হবে পরমসত্তা সার্বিকভাবে পূর্ব থেকেই তা জ্ঞাত থাকার কারনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সত্তার তাকদীর বা ভাগ্যকে চূড়ান্ত করে ফেলেন যা তিনি ছাড়া ফেরেশতারাও অবগত নন। এই চূড়ান্ত ব্যবস্থাকে

তাকদীরে মুবরাম বলে। ব্যক্তিসত্তা কর্তৃক সংঘটিত হবে বলেই তা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকে। ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে বলেই ব্যক্তি দ্বারা কাজটি সংঘটিত হবে না বরং কাজটি ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হবে বলেই তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসত্তার ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ লিখা আছে বলেই ঘটবেনা বরং ঘটবে বলেই এ লিখন প্রক্রিয়া। বস্তুত ইখতিয়ারাধীন বাস্তব জীবনে সংঘটিত বিপর্যয় বা উত্তরন ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় যে কোন পর্যায়েরই হোক তা মানুষের নৈতিক কাজেরই ফলাফল। এর জন্য মানুষই দায়ী। " যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেনা, আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন না।" - আল কুরআন।

এখন আসা যাক নৈতিক কাজের 'পরিমান' নির্ধারন প্রসঙ্গে। পরমসত্তা মানব আত্মায় 'বিবেক' নামক ন্যায় -অন্যায় বোধের ভিত্তি স্থাপন করে দেন। মানবসত্তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে এই বিবেকবোধ বিকশিত হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়। ক্রম বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় বিবেক বোধের প্রবৃদ্ধি ঘটে। আবার পরমসত্তা মানবসত্তায় 'সহজাত ধারণা'র আকারে 'বুদ্ধি'র সূচনা করে থাকেন। এই সূচিত বুদ্ধিও মানসিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের 'সহজাত ধারণা' সূলভ বুদ্ধি বৃত্তির সাথে এই বিকশিত 'বুদ্ধি'র সংযোগে ব্যক্তিসত্তা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমানের 'বুদ্ধি'মত্তা প্রাপ্ত হয়। আর এই বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগ হয় জীবনিক প্রক্রিয়ায় 'অভিজ্ঞতাজনিত বুদ্ধি'-র প্রবৃদ্ধি। অভিজ্ঞতা জনিত এ 'বুদ্ধি'র উৎপত্তি হয় দুটি প্রক্রিয়ায়। একটি হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার আভ্যন্তরিণ বুদ্ধিমত্তার জীবনিক প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে আর অপরটি হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার বাইরে সাধিত প্রতিটি লৌকিক - অতিলৌকিক জাগতিক ঘটনা - বিষয়াবলী প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। ব্যক্তিসত্তায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভিত্তিস্থাপিত 'বিবেকবোধ' এবং 'বিকশিত বিবেকবোধ' - এর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ তাৎক্ষনিক 'পূর্ণবিবেক' এবং 'সহজাত ধারণা', 'বিকশিত বুদ্ধি' ও 'অভিজ্ঞতাজনিত বুদ্ধি'র সমন্বিত বুদ্ধিমত্তা তথা প্রজ্ঞার ঐচ্ছিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি -পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত কারন অর্থাৎ তাকবীনী আইনের অধীনে মানবসত্তা কি ইচ্ছে পোষন করেছে, ইচ্ছার বাস্তবায়নে কি কর্ম-কৌশল গ্রহন করে কাজ সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত সেই কাজের পরিনতি হিসেবে ব্যক্তি-সমাজ প্রকৃতির তথা বিশ্বজনিন কল্যাণকর-অকল্যাণকর কি ফলাফল কতটুকু এসেছে এই সবকিছুর সমষ্টিই হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসত্তার 'নৈতিক কাজের পরিমান'। এই পরিমানের সমান অনুপাতেই সে 'নৈতিক পরিনাম' তথা নৈতিক কাজের ফলাফল হিসেবে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে।নৈতিক কাজের 'মান' নির্ণয় এবং 'পরিমান' নির্ধারনের উল্লেখিত উপকরণ সমূহের সঠিক প্রকৃতি ও পরিমান পরমসত্তা ছাড়া কেউই জ্ঞাত নন। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিসত্তায় প্রদত্ত বিবেকবোধ, এর বিকশিত অবস্থার তাৎক্ষনিক মাত্রা বা পরিমান, মানব সত্তায় অর্পিত সহজাত ধারনা, বিকশিত বুদ্ধি এবং বিভিন্ন

পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাজনিত বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ এবং সর্বোপরি স্বতন্ত্রভাবে এদের প্রত্যেকটির স্বরূপ বা প্রকৃতি উপলব্ধি কোন মানবসত্তার পক্ষেই সম্ভব নয়। সে জন্য সংগত কারণেই এগুলোর সঠিক হিসাব সংরক্ষন, পর্যবেক্ষন, সূক্ষ বিশ্লেষন, সিদ্ধান্ত গ্রহন অর্থাৎ চূড়ান্ত হিসাবের মাধ্যমে প্রকৃত ন্যায় বিচার তথা নৈতিক কাজের যথোপযুক্ত ফলাফল প্রদান পরমসত্তা ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর পরমসত্তা আল্লাহ তাঁর তাকদীর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মানবসত্তার প্রতিটি কাজের যথার্থ ফলাফল দিয়ে থাকেন যা ইহকাল এবং পরকালের কোন একটি কিংবা উভয়টি মিলে পূর্ণতা লাভ করবে।

আখিরাত বা পরকাল একটি অনিবার্য বিষয়-একটি সৃষ্টি-নৈতিক বাস্তবতা। যেমন উদাহরন স্বরূপ, একজন নেতা একটি সুদীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নির্যাতিত জাতিকে কোন স্বৈরাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করলেন কিন্তু আন্দোলনের চূড়ান্তপর্বে তিনি নিহত হলেন, আন্দোলনের ফসল উপভোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হলনা ইহজগতে। এখন প্রশ্ন হলো তাঁর এই মুক্তি আন্দোলন নামক সুমহান কাজটির ফলাফল তিনি কোন জগতে বা কালে ভোগ করবেন ? বিবেকের দাবী হচ্ছে তার এই সুমহান কাজ ও আত্মত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কার তাঁর পাওয়া উচিত। নীতিবিজ্ঞানও এর সমর্থক যে, অবশ্যই প্রতিটি নৈতিক কাজের ফলাফল ব্যক্তিসত্তা ভোগ করবে। তাহলে উক্ত নেতার গোটা আন্দোলনে তাঁর প্রকৃত ভূমিকার সঠিক পরিমাপ এবং তাঁর আত্মত্যাগের পরিমান সহ আন্দোলনের প্রেক্ষিত ফলাফলের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের জন্য একটি 'সুদীর্ঘকাল' ও সুন্দর 'ব্যবস্থাপনা' থাকা অনিবার্য। আর এটা যে পরমসত্তার নির্ধারিত পরকালীন ব্যবস্থাপনা এতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। পরকালই হচ্ছে মানব সত্তার উপযুক্ত, বাস্তব ও যৌক্তিক পরিনাম। একইভাবে একটি লোক দশটি লোককে খুন করল- জাগতিক বিচারে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে তাকে বড়জোর মৃত্যু দন্ড দেয়া যেতে পারে। আর এভাবে দশজন লোককে খুন করার জন্য শাস্তি পেল একজন লোক অর্থাৎ একজন লোকের মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করল দশজন লোককে মৃত্যু যন্ত্রনা দানকারী

'পরমসত্তা' পরম অভিজ্ঞার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা করেছেন। যেহেতু গোটা বিশ্ব প্রকৃতি তারই পরিকল্পিত এবং সৃষ্ট সেহেতু বিশ্বমানবতার জন্য তারই দেয়া জীবনাদর্শ ইসলাম-ই . হচেছ প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যশীল। কেননা প্রকৃতির স্রষ্টা হিসেবে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও সত্তার বৈশিষ্ট, প্রকৃতি, গুন, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি একমাত্র তাঁরই জ্ঞানের অধীন। অন্য কোন সত্তার পক্ষেই বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও বিষয়াবলীর

খুনী ব্যক্তিটি। সরল হিসেবে আরও নয়জন (১০-১=৯) লোককে নিহত করার শাস্তি তার পাওনা রয়ে গেল। অথচ একবার মৃত্যুদন্ড তথা ফাঁসি কার্যকর করার সাথে সাথেই সে ইহজগত ছেড়ে চলে গেল। এখন বাকী নয়টি হত্যাকান্ডের জন্য তাকে নয়বার মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে কিভাবে? এজন্য প্রয়োজন তাকে পুনরায় জীবিত করে বারবার মৃত্যুদন্ড দিয়ে শাস্তি প্রয়োগ করা। ইহজগতে এটা কি সম্ভব? অবশ্যই অসম্ভব। অথচ শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এজন্য একটি মাত্র ব্যবস্থাই স্বীকৃত হয়ে যায়- পরকালীন বিচার ব্যবস্থা। যেখানে সংঘটিত এ দশটি হত্যাকান্ডের জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তথা বিশ্বজনিন কি এবং কতটুকু ক্ষতিসাধিত হয়েছে তার পুংখানুপুংখ হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সঠিক 'ন্যায়বিচার' করা হবে। আর এ ন্যায়বিচার সম্পন্ন করবেন স্বয়ং পরমসত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই সবচেয়ে ন্যায়বিচারক। (আল কুরআন।) উপরের সার্বিক আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, জাগতিক তথা ইহকালীন বিচার ব্যবস্থায় সঠিক ও যথার্থ ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। তবে জাগতিক বিচারে তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব হতে পারে তা আলোচনা করা যায়। 'পরমসত্তা' পরম অভিজ্ঞার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা করেছেন। যেহেতু গোটা বিশ্ব প্রকৃতি তারই পরিকল্পিত এবং সৃষ্ট সেহেতু বিশ্বমানবতার জন্য তারই দেয়া জীবনাদর্শ ইসলাম-ই হচ্ছে প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যশীল। কেননা প্রকৃতির স্রষ্টা হিসেবে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও সত্তার বৈশিষ্ট, প্রকৃতি, গুন, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি একমাত্র তাঁরই জ্ঞানের অধীন। অন্য কোন সত্তার পক্ষেই বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও বিষয়াবলীর জ্ঞান একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং প্রকৃত জীবনদর্শন উপস্থাপন করা মানব সত্তার সাধ্যাতীত। শুধুমাত্র পরমসত্তার পক্ষেই এটা সম্ভব এবং এ দর্শনই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যশীল, সাম্য, ইনসাফ ও শান্তির ধারক। আর এ জীবনদর্শনের নাম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে সংগঠিত সামাজিক অবকাঠামো তথা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নৈতিক কাজের জবাবদিহীর সর্বাধিক অনুভূতি সম্পন্ন বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বদের বিচারক নিয়োগ এবং পরমসত্তা প্রদত্ত- ইসলামী দন্ডবিধির অধীনে জাগতিক বিচার কাজ সম্পন্ন হলেই তুলনামূলক ভাবে সর্বাধিক ইনসাফ তথা সুবিচার

জ্ঞান একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং প্রকৃত জীবনদর্শন উপস্থাপন করা মানব সত্তার সাধ্যাতীত। শুধুমাত্র পরমসত্তার পক্ষেই এটা সম্ভব এবং এ দর্শনই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যশীল, সাম্য, ইনসাফ ও শান্তির ধারক। আর এ জীবনদর্শনের নাম হচ্ছে ইসলাম।

আশা করা যেতে পারে। প্রকৃত এবং সঠিক ইনসাফ ভিত্তিক পূর্ণ ফলাফল পরকালীন বিচার ব্যবস্থার সাথেই সংশ্লিষ্ট।

মাসিক পৃথিবী, সেপ্টেম্বর '৯৩-এ প্রকাশিত।

প্রেমের রিয়্যালিটি

'প্রেম' সৃষ্টিজগতে একটি রহস্যময় অনুভূতির নাম। স্রষ্টার এক শ্রেষ্ট নিয়ামত এই মানবিক অনুভূতি দৃশ্যতঃ দুর্বোধ্য অথচ বাস্তবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ক্রিয়াশীল এবং নিয়মতান্ত্রিকতায় সৃষ্টিশীল। মানবসত্তার সহজাত এই চিরন্তন রোমান্টিকতা যা একান্তই নৈসর্গিক এবং সৃষ্টি ক্রীড়নক। অনস্বীকার্য এই সত্য অনুভূতির অস্বীকার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিকাশের অস্বীকৃতির শামিল বটে। প্রেম এক চিরন্তনী আবেগ, বাস্তব অথচ অদৃশ্য অনুভূতি যা শুধুমাত্র অনুভবেয়। আর এই রহস্যময় অনুভূতির পদ্ধতিগত সরল দিক হচেছ ক্রমান্বয়ে ভাললাগা - প্রেম - ভালবাসা।

ভালবাসে সবাই। অন্তত স্বাভাবিক সত্তার প্রতিটি মানুষ। মাত্রা বা পরিমান যা-ই থাক। 'ভালবাসা' চার অক্ষরের ছান্দসিক এই শব্দটির কাছে আত্মনিবেদিত হয়নি যে , সে অবশ্যই অ-মানুষ, মানবিক মূল্যবোধ বা বৈশিষ্ট হতে বঞ্চিত এক চারণিক জীব। মনোজগতের নিভৃত কুঞ্জে কখন কিভাবে প্রেম নামক এই নৈসর্গিক অনুভূতি সৃষ্টি হয় মানবসত্তা যেন তা টেরই পায়না। এ-এক অনির্বচনীয় সত্য। রাজা-প্রজা, আমীর -ফকির কেউই এর ব্যতিক্রম নন। প্রেম অবশ্যই অস্তিত্বশীল একটি সত্য অনুভূতি। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সৃষ্টিশীল ইতিবাচক; অনিয়মতান্ত্রিকতায় ধ্বংসকামী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং নেতিবাচক। সুন্দরতম সমাজ সংসার বিনির্মানে প্রেমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পবিত্রতম প্রয়োগে প্রেম স্বর্গীয় ,অপপ্রয়োগে প্রেম নারকীয়।

সৃষ্টি জগতে বিবদমান প্রতিটি প্রেমের উৎস একই। একই পরম উৎস হতে উৎসারিত কিংবা শাখা প্রশাখায় প্রসারিত অর্থাৎ একই উৎসের প্রেম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত হয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন রূপ ধারন করে। মনস্তাত্তিক বিশ্লেষনে মুলতঃ প্রেমের ভিত্তি হচ্ছে - সহানুভূতিশীল মমত্ববোধজাত সৌন্দর্যবোধ থেকে সৃষ্ট শ্রদ্ধাজনক রোমান্টিক অভিব্যক্তি। আর সে কারনেই ভাবগত প্রতিটি প্রেমই একই প্রেম। যেমন - স্রষ্টা প্রেম, মানব প্রেম, দেশ প্রেম, আদর্শ প্রেম ইত্যাদি। একই উৎসের এই প্রেম বিভিন্ন ভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়ে কখনও বা মাতৃপ্রেম, পিতৃপ্রেম, সন্তানপ্রেম, নারীপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম, সাহিত্য প্রেম ইত্যাদিতে রূপ পরিগ্রহ করে ভিন্ন আঙ্গিকে , ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মেজাজে - ভিন্ন বেশে। প্রতিটি প্রেমের অন্তরর্নিহিত ক্রিয়াশীল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি হলো সুগভীর

মমত্ববোধ। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় বরং এটুকু বলা যেতে পারে, পরমসত্তা হতে উৎসারিত মানব সত্তার প্রেম স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন বেশে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন রুচিতে বিকশিত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতরূপ প্রতিটি প্রেমই বৈচিত্রময় সৃষ্টির নেশায় উন্মুখ - অধীর থাকে। এই বৈচিত্রময় বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে হয়ত স্রষ্টার এমনি কোন ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা ছিল। যার ফলশ্রুতিতে বললেন - 'হও' আর অমনি হয়ে গেল (আলকুরআন।) পরমসত্তা সৃষ্ট প্রতিটি জীবের উপযোগী জগত বিনির্মানের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের বৈচিত্রময় রূপ দিয়ে সৃষ্টিকে আবারও সৃষ্টিশীল করেছেন। সৃষ্টির নিমিত্তে এটাই স্রষ্টার প্রেম। স্রষ্টার প্রেমের এই ধারা বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকবে। অন্যদিকে স্রষ্টার অপরিসীম ক্ষমতা ও গুনাবলী, সীমাহীন ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টির নিমিত্ত ত্রুটিহীন জীবনাদর্শ ও অসংখ্য নিয়ামতের প্রাচুর্য ইত্যাদি বিবেচনায় পরম আদর্শিক জীবন চর্চার মাধ্যমে স্রষ্টার সত্তায় সৃষ্টি সত্তায়িত হয়ে পড়ে। যা থেকে সৃষ্টি এক পরম সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভবের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ - সান্নিধ্যে পাওয়ার ব্যাকুল বাসনা। মিলনের পরম আকাংখায় অধীর হয় তার অন্তর-আত্মা। প্রেমাস্পদের সন্তোষ অর্জনই হয় তার সকল চিন্তা ও কাজের প্রেরণা। এ লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত হয় তার সকল তৎপরতা। পরম পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে এক বস্তুনিষ্ট আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রায় প্রাগ্রসর হয় সৃষ্ট মানবসত্তা। পরম আবেগে বিনয়ের সাথে ঘোষনা করে প্রেমের পরম শ্লোগান - " ইন্নাসসালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার সালাত (নামাজ), আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য" (আলকুরআন)। প্রেমাস্পদকে পাওয়ার পরম প্রত্যয়ে মানবসত্তা প্রতিটি মুহূর্তে খুশী রাখতে চায় তার প্রেমিক সত্তাকে। এজন্য প্রেমিকের দেয়া প্রতিটি নির্দেশ (আইন) কে নির্দ্বিধায় মেনে চলতে সক্রিয় হয়ে উঠে- ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমিকের (আল্লাহর) সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। আমৃত্যু প্রচেষ্টা (জিহাদ) চলতেই থাকে। এভাবে আদর্শিক সংগ্রামী অভিযাত্রায় ক্রমান্বয়ে সাত্তিক বিকাশের মাধ্যমে মানব সত্তা পরমসত্তার আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য লাভ করে প্রেমের বেহেশতী আনন্দ - সুখ - সৌন্দর্যে আত্ম সমৃদ্ধ হয়। প্রেমের পরীক্ষায় সর্বাত্মক নিবেদিত মানবসত্তা এমনি করেই শাশ্বত প্রেমের বিজয় ঘোষনা করে। এটাই স্রষ্টার জন্য সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম। আর এ প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রকৃতির পরম প্রকাশমান দিক।

প্রেমের আধার হচ্ছেন পরমসত্তা। এই মৌল কেন্দ্রিকতার জন্যই স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিপ্রেম অর্থাৎ পরমসত্তা প্রদত্ত নিয়মতান্ত্রিকতার পরিপন্থী কোন পন্থায় ভিন্ন দুটি মানবসত্তায় সংঘটিত কিংবা সংগঠিত প্রেম কখনই ইতিবাচক হতে পারে না- সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটাতে পারে না। মানবসত্তার এ প্রেম তখনই শুধুমাত্র

কল্যানকামী হতে পারে যখন তা পরমসত্তার সান্নিধ্যে ক্রিয়াশীল হয় - আদর্শিক পরিমন্ডলে বিচরণশীল থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রেম কি তবে শর্তহীন নয়? অবশ্যই প্রেম নিঃশর্ত নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে- সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন দুটি মানবসত্তার জন্য ভিন্নরূপ শর্ত পূরনের মাধ্যমেই প্রেম সংঘঠিত হয়। সৌন্দর্য, সহানুভূতি, যৌনানুভূতি ইত্যাদি একক কিংবা সামষ্টিক ভাবে অথবা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কমবেশী আনুপাতিক সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে ভিন্ন মেজাজের প্রেমানুভূতি সৃষ্টি করে। প্রেম একটি বাস্তব অনুভূতির ব্যাপার। সুতরাং প্রেম অবশ্যই অস্তিত্বশীল। অতএব 'প্রেম শর্তহীন'- এ ধারনাটি সংগতকারনেই 'কার্যকারন' নিয়মের পরিপন্থী। ধরন বা প্রকৃতি যা-ই হোক প্রেমের বাস্তবতা অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ। প্রেম (কার্য) সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই শর্ত হিসেবে এক বা একাধিক 'কারন' ক্রিয়াশীল থাকবে। প্রেম সংঘটনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত এসব কারন যদি প্রেমিক সত্তাটির স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন না করে থাকে তবে সৃষ্ট প্রেমের জন্য প্রেমিক সত্তাকে কোনভাবেই দায়ী করা চলেনা। এই প্রেমানুভূতি একান্তভাবেই প্রেমিক সত্তার আত্মগত উপলব্ধি, মানসিক বিষয় - আইনগত প্রক্রিয়ায় যার কোন অস্তিত্ব নেই এবং অন্তর্গত এই প্রেম সৃষ্টির জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ না থাকার জন্য নৈতিকতার দিক থেকেও জবাবদিহীর আওতামুক্ত। এখন আসা যাক প্রেমের প্রেক্ষিত আচরন প্রসঙ্গে। যেহেতু মানব সত্তার প্রতিটি আচরনই (বাস্তব) শরীআত বা আইনের অধীন সেজন্য প্রেমিক সত্তাটি তার প্রেমাস্পদকে প্রাপ্তির জন্য এমন কোন প্রক্রিয়া চালাতে পারেনা অথবা প্রেমাস্পদের সাথে এমন কোন আচরন করতে পারেনা যা আইনসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ যা সুস্পষ্টভাবেই আইনের লংঘন। কেননা অনুভূতি বা কামনার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তাবায়ন যেকোন ভাবেই স্বীকৃত হলে নৈতিকতা বিপর্যস্ত হবে। অথচ প্রেম নামক অনুভূতি মানব মননশীলতায় এত সুগভীর ক্রিয়াশীল যে, ক্রমান্বয়ে এই ক্রিয়াশীল অনুভূতি এমনি এক বলিষ্ট মনস্তাত্তিক রূপ পরিগ্রহ করে যে, দুটি ভিন্ন সত্তায় প্রেম সংঘটনের ক্রমধারায় একটি অভিন্ন সত্তায় যেন সত্তায়িত হয়ে পড়ে, যা থেকে প্রত্যাবর্তনের সমূহ মানসিক দ্বার আপাতঃ বন্ধ হয়ে যায়। সত্তার অজান্তেই ঘুরে ফিরে বারে বারে প্রেম সত্তাটি তার একান্ত স্বকেন্দ্রিক ভূবনে পরিভ্রমন করতে থাকে। ফলে প্রেমিক সত্তাটি যখনই প্রেমের সফল প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তখনই সে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। ইতিবাচক বিবেক তাড়না এবং পরম সত্তা প্রদত্ত আদর্শিক জীবন চর্চার মাধ্যমেই কেবল এই প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে নিজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এখন প্রশ্ন হলো, যে অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিসত্তা দায়ী নয় সেই অনুভূতি থেকে সৃষ্ট পেরেসানী ও কষ্টের মুল্যায়ন তাহলে কিভাবে হবে যদি না বৈধ প্রাপ্তি ঘটে? এক্ষেত্রে সংগত জবাব হবে, যে পরম উৎস

হতে মানবসত্তায় প্রেমবোধ অর্পিত বা উৎসারিত হয়েছে এবং পরমসত্তার সৃষ্ট প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যাকে প্রভাবিত বা সমৃদ্ধ করেছে, সেই পরম প্রেমের আধার পরমসত্তাই তাঁর ঐশী ব্যবস্থাপনায় মানবসত্তার এ প্রাসঙ্গিক দুঃখ কষ্ট ও পেরেসানীর আনুপাতিক হারে ইহকাল ও পরকালে আংশিক ও পূর্ণভাবে অর্থাৎ উভয়কালের সমন্বয়ে পূর্ণফলাফল প্রদান করবেন যা হবে খুবই যথোপোযুক্ত, ন্যায়সংগত ও সমানুপাতিক। কেননা প্রতিটি ব্যাপারেই যথোপযুক্ত ফলাফল প্রদানে পরমসত্তা স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং বৈধ প্রাপ্তিতে আইনগত প্রতিবন্ধকতার জন্য হতাশ কিংবা অনৈতিক - অন্যায় আচরন কোন প্রকৃত প্রেমিকের ক্ষেত্রে কাম্য হতে পারেনা এবং একই ভাবে আত্মবিনাশী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন ও কোনভাবেই কোন প্রেমিক নিতে পারেনা। প্রেমাষ্পদের জন্য এ জাতীয় আত্মবিনাশী নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহন অবশ্যই প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ বা কুরবানী নয়, নয় কোন গৌরব বা মর্যাদার বিষয় বরং এটাকে বলা চলে পরাজিত সৈনিকের লজ্জাজনক আত্মপলায়ন। অতএব স্বল্প মেয়াদী আপাতঃ অপ্রাপ্তিকে স্থায়ীও চিরঞ্জীব প্রাপ্তির ভিত্তি বিবেচনা করে প্রেমিক বা প্রেমিকার সার্বিক কল্যাণ কামনা- সহযোগিতা এবং চরম ধৈর্য্য ও সবর ইখতিয়ারের মাধ্যমে মানসিক স্থিতি ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জন করাই হবে প্রকৃত প্রেমিকের কাজ। আর এটাই হচ্ছে প্রেমের ক্লাসিক পদ্ধতি - সাহসী প্রেমিকের সঠিক ভূমিকা। যা সার্বক্ষনিকভাবেই বেহেশতী আনন্দ অনুভবে চিরকল্যানকর, শাশ্বত সত্য আর সৌন্দর্য্যে চির সমুজ্জ্বল। অমর প্রেমের কালজয়ী ইতিহাস। এতো গেল সংঘটিত প্রেমের কথা। এবার আসা যাক প্রেম সংগঠন প্রসঙ্গে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছার স্বাধীনতা বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে সেজন্য সংগঠিত প্রেমের ক্ষেত্রে জবাবদিহীতা বা দায়বদ্ধতার অবকাশও বেশী। একারনেই প্রেম সংগঠনের ক্ষেত্র বা প্রেম সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বা এর প্রেক্ষিত আচরন যদি হয় পরমসত্তার নির্দেশিত বা অনুমোদিত পন্থায় তবেই তা হতে পারে কল্যাণকর এবং সৃজনশীল অন্যথায় তা হবে অশান্তি আর ধ্বংসকামীতায় প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রকৃত প্রেমের ভিত্তি হচ্ছে পবিত্রতা। যেহেতু প্রেমের আধার পরমসত্তা এবং পরমসত্তা যেহেতু সার্বিকভাবেই পবিত্র সত্তা সেজন্য পরমসত্তা হতে উৎসারিত প্রেম সংগতকারনেই পবিত্র। অতএব যৌবনের পবিত্রতম ব্যবহারিক প্রক্রিয়াতেই প্রেম বিকাশমান। যখনই প্রেমের এই পবিত্রতা বিনষ্ট হবে তখনই তা অবৈধ রূপ নেবে। যা সার্বিক অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল এই মানবিক অনুভূতি প্রেম যখনই নিছক দেহ-যৌবনকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে পড়ে তখন আর সামাজিক অবক্ষয়ের সীমা থাকেনা। প্রেম একটি পবিত্র সুন্দরের নাম অথচ দুঃখজনকভাবে সেই প্রেম হয়ে যায় নরনারী কিংবা ছেলেমেয়েদের অবাধ-অবৈধ যৌন

সুতরাং প্রেমের পরম উৎস বা পরমসত্তা প্রদত্ত পরম আদর্শিক জীবনব্যবস্থার অধীনে উন্মুক্ত পরিসরে প্রেমের বাস্তব আচরণ তথা মনোদৈহিক উপভোগই হোক প্রেমের কাংখিত পরিনাম।

'যৌবন' মানব প্রেমের এক অতি উর্বর ক্ষেত্র। যৌবনের নিমিত্তে প্রেম নয় বরং প্রেমের নিমিত্তেই যৌবন। প্রেমের একটি বাড়তি আনন্দজনক ও সৃষ্টিশীল দিক। মানব-মানবীর প্রেমকে আরোও মহিয়ান, আরোও বিশ্বস্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ করার নিমিত্তেই যৌবনের অবতারনা। সেজন্য শুধুমাত্র দেহকেন্দ্রিক বা যৌবননির্ভর প্রেম কোনভাবেই প্রকৃত প্রেমের আসন পেতে পারেনা। কেননা প্রকৃত প্রেমের ভিত্তি হচ্ছে পবিত্রতা। যেহেতু প্রেমের আধার পরমসত্তা এবং পরমসত্তা যেহেতু সার্বিকভাবেই পবিত্র সত্তা সেজন্য পরমসত্তা হতে উৎসারিত প্রেম সংগতকারনেই পবিত্র। অতএব যৌবনের পবিত্রতম ব্যবহারিক প্রক্রিয়াতেই প্রেম বিকাশমান। যখনই প্রেমের এই পবিত্রতা বিনষ্ট হবে তখনই তা অবৈধ রূপ নেবে। যা সার্বিক অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল এই মানবিক অনুভূতি প্রেম যখনই নিছক দেহ-যৌবনকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে পড়ে তখন আর সামাজিক অবক্ষয়ের সীমা থাকেনা। প্রেম একটি পবিত্র সুন্দরের নাম অথচ দুঃখজনকভাবে সেই প্রেম হয়ে যায় নরনারী কিংবা ছেলেমেয়েদের অবাধ-অবৈধ যৌন চর্চার মাধ্যম। তথাকথিত প্রেমের নামে সামগ্রিক অশ্লীলতা প্রাধান্য পায়। যুবক যুবতী এবং ছেলেমেয়েদের মাঝে চলে প্রেমের প্রতিযোগিতা। ছিনতাই, অপহরন, এসিড নিক্ষেপ, বিয়ের আসরে সন্ত্রাস ইত্যাদিতে ভারাক্রান্ত হয় সমাজ-সংসার, দুশ্চিন্তা, হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অভিভাবকরা।

চর্চার মাধ্যম। তথাকথিত প্রেমের নামে সামগ্রিক অশ্লীলতা প্রাধান্য পায়। যুবক যুবতী এবং ছেলেমেয়েদের মাঝে চলে প্রেমের প্রতিযোগিতা। ছিনতাই, অপহরন, এসিড নিক্ষেপ, বিয়ের আসরে সন্ত্রাস ইত্যাদিতে ভারাক্রান্ত হয় সমাজ-সংসার, দুশ্চিন্তা, হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অভিভাবকরা।

অন্য দিকে তথাকথিত প্রেমের বন্যায় ভাসতে ভাসতে কত অবলারা নিষিদ্ধ পল্লীতে বাসর গড়ে তার হিসেব নেই। শরীরের ক্রমবর্ধনশীল মধ্যাংশের বোঝা বইতে না পেরে কত কুমারী যে আত্মাহুতি দেয় কেইবা জানে ! কিংবা সিডাক্সিন, মরফিন, হিরোইন, গাঁজা, মদ আর পেথেড্রিনের আশ্রয়ে কত যে সম্ভাবনাময় যুবাপ্রেমিক চরমাশ্রিত হয় তার বালাই নেই। প্রেমের অভিনয়ে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফায়দা হাসিলের

অন্য দিকে তথাকথিত প্রেমের বন্যায় ভাসতে ভাসতে কত অবলারা নিষিদ্ধ পল্লীতে বাসর গড়ে তার হিসেব নেই। শরীরের ক্রমবর্ধনশীল মধ্যাংশের বোঝা বইতে না পেরে কত কুমারী যে আত্মাহুতি দেয় কেইবা জানে ! কিংবা সিডাক্সিন, মরফিন, হিরোইন, গাঁজা, মদ আর পেথেড্রিনের আশ্রয়ে কত যে সম্ভাবনাময় যুবাপ্রেমিক চরমাশ্রিত হয় তার বালাই নেই। প্রেমের অভিনয়ে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফায়দা হাসিলের জন্য পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক শ্রেণীর পেশাদার শিক্ষিতা মেয়েরা। এদের অবাধ বিচরনে কুলুষিত হয় নাগরিক সমাজ আর ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হয় সম্ভাবনাময় যুব-তরুন সমাজ। ফলশ্রুতিতে প্রেম শব্দটিই একটি বীতশ্রদ্ধার বিষয় রূপে স্বীকৃত হয়। অথচ মৌলিক অর্থে প্রেমই হচ্ছে সৃষ্টি জগতের মূল চালিকা শক্তি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির বন্ধনসূত্র। গোটা বিশ্ব প্রকৃতিই প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই প্রেমের সার্থক প্রয়োগই হোক আজকের শপথ। অবৈধ প্রেম প্রতিরোধে গৃহীত হোক ইসলামী পর্দা ব্যবস্থার সফল প্রয়োগ। প্রেম ছিল, প্রেম আছে, প্রেম চিরকাল থাকবে। পরমসত্তা হতে উৎসারিত শাশ্বত প্রেমের আদর্শের সৈনিকরা পরম আদর্শিক জীবন ও প্রেম চর্চার মাধ্যমে চিরকাল প্রেমের বিজয় প্রতিষ্ঠা করবে- গড়ে তুলবে প্রেমময় বিশ্ব।

জন্য পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক শ্রেণীর পেশাদার শিক্ষিতা মেয়েরা। এদের অবাধ বিচরনে কুলুষিত হয় নাগরিক সমাজ আর ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হয় সম্ভাবনাময় যুব-তরুন সমাজ।

মাসিক পৃথিবী '৯৪ সংখ্যায় ঈষৎ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত।

হিজাব ঃ জীবন ঘনিষ্ট একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ

প্রতিটি সত্যঅনুভূতিকে সর্বাধিক বিশ্বস্ততা ও বস্তুনিষ্টতার সাথে উপস্থাপন করাই প্রতিটি সত্য-প্রিয় ব্যক্তি সত্তার সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি চর্চার বাস্তব ফলশ্রুতিই হচ্ছে সত্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে শাশ্বত সত্যের বলিষ্ট উচ্চারন। আর সেই শাশ্বত সত্যের পথ - পরিক্রমায় পরমসত্যে পরমাশ্রিত হওয়া। সত্য যতই অপ্রিয় হোক সত্যকে সত্য বলা আর অসত্যকে অসত্য বলাই প্রতিটি সত্যপ্রিয় এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তিসত্তার নৈতিক দায়িত্ব এবং এটিই সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তিসত্তার মুক্তবুদ্ধি চর্চার নিমিত্ত অঙ্গীকার হওয়া উচিত। ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ম

বিশ্লেষন - পর্যবেক্ষন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে একটি সুন্দরতম কল্যানকামী প্রগতিশীল সমাজ কাঠামো বিনির্মানের উপযোগী সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এটিই সর্বাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি।

'নারী'! এক মুগ্ধকর উচ্চারন। এক আকর্ষনীয় বিষয়। অন্ততঃ যৌবন প্রদীপ্ত প্রতিটি সত্তার কাছে। কামনার প্রতিটি স্তরে কেঁপে কেঁপে বয়ে যাওয়া এক ক্রীড়ন্মোখ অনুভূতি। এটি একটি বাস্তব অনুভূতি। সৃষ্টিধারার এক অপরিহার্য উপাদান। 'নারী' সৃষ্টিজগতে পরম দয়ালু স্রষ্টার এক সুন্দরতম নিয়ামত। সৌন্দর্য্যের সোপান; সুতীব্র আকর্ষণ কেন্দ্রিকতার এক সৃষ্টি বিন্দু - সুগঠিত মনোহর মানবী সত্তা। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মেই প্রতিটি যুব সত্তায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় দেহজ প্রাপ্তির সুগভীর অন্বেষায়। এ যেন এক নৈসর্গিক শরীর - ক্রন্দন। পারিপার্শ্বিক আনুকুল্যে এর মাত্রা বেড়ে যেতে চায় সীমাহীন আবার বিধিবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিকতায় সুগভীর আনন্দ জনক সৃষ্টিশীলতায় গতিশীল হয়। এগুলো সবই সত্য-মানবিক অনুভূতি। এসবই এক সুমহান পরিকল্পকের কুশলী পরিকল্পনার অংশ; যে মহাপরিকল্পনার এক একটি ক্রীড়নক উপাদান হচ্ছে স্বকীয়ভাবে 'আমি' নামক প্রতিটি মানব সত্তা। সহজাত এ নৈসর্গিক শারিরীক বিধান থেকে পরিত্রান প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিছক আত্মপ্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা পরমসত্তা তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকেই 'নর ও নারী' পরস্পর আকর্ষন ধর্মী বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং এক নিয়মতান্ত্রিক সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিকে আবারও সৃষ্টিশীল করেছেন। এই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া পরমসত্তার নির্ধারিত নিয়মতান্ত্রিকতার আওতামুক্ত হয়ে গেলে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি বিনাশী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং প্রগতি আর আধুনিকতার ছদ্মাবরনে বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় তছনছ করে দেয় নৈতিক জীবনের কল্যানকামী জনপদ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রেম - ভালবাসার নৈসর্গিক বন্ধন। দেহযান্ত্রিক ধ্বংসাত্মক পথের অভিযাত্রী হয় যুব মানসসত্তা। এমনিভাবে, মানবসত্তার সামষ্টিক জীবন যাপন প্রক্রিয়া নিতান্ত জঘন্য পশুচারনিক বর্বরতায় বিলীন হয়ে যায়। গড়ে উঠে 'কামনা' আর 'ভোগ'- এর জ্বালাময়ী বিষাক্ত নরক-সমাজ।

পরম প্রেমের আধার পরমসত্তা সব সময়ই সৃষ্টিজগতের কল্যানকামী। এজন্য সৃষ্টির উপর তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জুলুমের অবকাশ নেই। এটি তাঁর সুমহান স্বভাব-বিরূদ্ধ। প্রতিটি মানবসত্তায় 'নর ও নারী' পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়ে সেই আকর্ষন বিশিষ্টতার বাস্তব ফলশ্রুতি তথা দৈহিক মিলনের তৃপ্তিজনিত মানসিক প্রশান্তি প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে তারই সৃষ্টির সাথে জুলুম করবেন এমনটি হওয়া তাঁর সুমহান সিফাতের পরিপন্থী। সংগতকারনেই মানবসত্তার সহজাত 'কামনা'-র সফল প্রয়োগ ঘটানোর 'নিয়মতান্ত্রিক' অবকাশ দিয়েছেন। এ নিয়মতান্ত্রিক অবকাশ তথা পরস্পর

আকর্ষনধর্মী ভিন্ন দুটো সত্তা একটি বিধিবদ্ধ অভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক উপভোগের মাধ্যমে বিনির্মান করে একটি কল্যানকামী প্রেমময় সংসার। এ প্রক্রিয়াতে বাস্তব অর্থে গড়ে উঠে কল্যানকামী প্র-গতিশীল জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন প্রকার নৈতিক অবক্ষয়ের অবকাশ থাকে না। এই বাস্তব সৃষ্টি ক্রীড়নক নৈসর্গিক পদ্ধতির অস্বীকার নেতিবাচক মুক্তবুদ্ধিজাত জারজ মানসিকতার ফলশ্রুতি। এসব মুক্তবুদ্ধির দাবীদাররা বিয়ে নামক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে অভিহিত এবং মূল্যায়িত করেন একটি নারী 'সত্তার সমগ্র জীবনের জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত দেহ ভাড়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদন' রূপে। কি জঘন্য বেশ্যাবৃত্তিক মানসিকতা! বস্তুবাদী দার্শনিক কার্লমার্কস বিয়েকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। অথচ বিয়ে একটি উৎপাদনশীল উপভোগ্য প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে নেই কোন সৃষ্টি বিনাশী অবকাশ বরং এক নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় প্রাগ্রসর হয় বিশ্বজনিন সৃজনশীলতা। সেজন্য বিয়েই হচেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিশীল, পবিত্র ও নৈতিক যৌনাচার মাধ্যম। এর বাইরে নরনারীর অবাধ যৌনাচার নিঃসন্দেহে পশুজনিন; মানবতা ও নৈতিকতার সুস্পষ্ট লংঘন এবং ভয়াবহ পরিনতিবাহী- অবিভাবকহীন লক্ষকোটি জারজ সন্তানের বুভুক্ষু চিৎকার, যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত বিশ্বমানবতার সকরুন হাহাকার। সংগতকারনেই বিয়ে নামক স্বীকৃত পদ্ধতির বাইরে নরনারীর দেহক্রীড়নক সম্মিলন অথবা এর সহায়ক কিংবা প্রেরণাদায়ক প্রতিটি প্রেক্ষাপট সৃষ্টির অবকাশ তথা দৈহিক মিলনের 'কামনা' সৃষ্টির উপায়, উপকরন- উপাত্ত সার্বিকভাবেই পরিত্যজ্য হওয়া উচিত। এটা নৈতিক পরিবেশ সংরক্ষনে অপরিহার্য শর্ত। যৌন স্বেচ্ছাচার রোধে অবশ্যই এটা মুক্তবুদ্ধিবৃত্তির সফল ফলশ্রুতি। পরমসত্তা পরম অভিজ্ঞার মাধ্যমেই নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন। এর বাস্তব চর্চাবৃত্তিক ফলশ্রুতি হিসেবে পর্দা প্রথা নামক এক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ ফরজ করে দিয়েছেন। নারীদের জন্য পর্দা করা যেমন ফরজ তেমনি পুরুষদের জন্যও পর্দা মেনে চলা ফরজ। জীবন ঘনিষ্ট এ প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসু এবং প্রকৃষ্ট অর্থে গতিশীল জীবনের জন্য বাস্তবিকই প্রতিশ্রুতিশীল। সুন্দর ও সফল ব্যক্তিনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনের জন্য এ পদ্ধতি প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস একটি ব্যবস্থাপনা। পর্দা সিষ্টেমই সর্বাধিক বস্তুনিষ্ট উপভোগ্য যৌনাচারের অবকাশ সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সমাজ বিনির্মানে সর্বাধিক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

'সত্য' সার্বক্ষনিকভাবে সার্বিক অর্থেই সুন্দর। প্রকৃত সুন্দরই সত্য। প্রকৃত সত্য-ই আসল সুন্দর। 'সত্য' ও 'সুন্দর' -এর সহাবস্থান সুখী নব দম্পতীর মতই। সত্য উপলব্ধির বিষয় আর সুন্দর উপভোগ্য। সে জন্য সুন্দরকে যথার্থ উপভোগের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি সম্ভব। সত্যের স্বাভাবিক অবস্থান

জটিল অর্থাৎ রহস্যাবৃত। রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমেই সত্যের প্রকাশ ঘটে। একইভাবে যেহেতু সত্য ও সুন্দর সহাবস্থানকারী তাই সত্য বিচ্ছিন্ন সুন্দরের একক কিংবা স্বকীয় অবস্থান নেই। সত্য ও সুন্দর সব সময়ই সমান্তরাল। উভয়টিই একটি রহস্যময় আবরনে আবৃত থাকে অর্থাৎ যেন একটি ইতিবাচক কৌশল প্রতারণার আবরনে স্বীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য হিফাজত করে। সত্য আরাধ্য ; গবেষনা ভিত্তিক। একইভাবে সুন্দরের প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য এবং কষ্টজনক প্রাপ্তিই সর্বাধিক উপভোগ্য। আর সেজন্যই অসংখ্য অসত্য আবরনে যেমন সত্যের অবস্থান ঠিক তেমনি পর্দা বা হিজাবের কুশলী আবরনে ঢাকা থাকবে রমনী নামক সজীব সুন্দরের অবস্থান। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। হিজাবের রহস্যময় আবরনে রমনী তার কমনীয়তাকে সংরক্ষণ করবে - এটাই তো খুবই স্বাভাবিক কথা। এ-তে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। রমনী নামক এই সজীব সত্তাটি যতই তার রহস্যময় পরিসর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে ততই তার সলাজ-বিনম্র বিশিষ্ট লাবন্যময় কমনীয়তার ঘাটতি বেড়েই চলবে। উন্মুক্ত পরিসরে মোহনীয় সেই সজীব সুন্দর ক্রমান্বয়ে এক আবেগহীন 'উৎকট সুন্দর' রূপ নেবে যেখানে বিমুগ্ধতার বদলে প্রাধান্য পাবে দেহযান্ত্রিকতা, ভালবাসার পরিবর্তে প্রাধান্য পাবে নিছক যৌনতা। রমনী নামক বিস্ময় - সৌন্দর্য পরিণত হবে আবেদন ও সংবেদনহীন এক যৌন মেশিনে। সুলভ প্রদর্শনীর কারনে রমনীদেহের প্রতিটি অঙ্গ পৃথকভাবে পুরুষের আকর্ষণ আর বিস্ময় সৃষ্টিতে সক্ষম হয়না। নর দেহের যৌন যান্ত্রিক চাহিদার নিমিত্ত নারী হয়ে যায় টাইপ মেশিনে ব্যবহৃত বিধ্বস্ত কার্বন পেপারের মত। পর্দা পদ্ধতির মাধ্যমেই নারী তার সার্বিক প্রত্যঙ্গে অব্যাহত ভাবেই রমনীয় কমনীয়তা ধরে রাখতে সক্ষম। হিজাবী রমনীর ত্বক সুরক্ষিত থাকার কারনে স্বাভাবিক ভাবেই নরম অনুভূতিশীল থাকে। ফলে বিধিবদ্ধ অনুমোদিত উন্মুক্ত পরিসরে একজন হিজাবী রমনী খুব সহজেই আনন্দ সুখজনক বিমুগ্ধমাদকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে বেপর্দা নারী সামগ্রীক লাবন্যতা হারিয়ে খসখসে চামড়ার রুক্ষ অনুভূতিতে বিশুষ্ক বিরূপ বেশে শুধু মাত্র শারিরীক স্খলন ঘটানোর প্রয়াসই সৃষ্টি করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষনে এটা সুপ্রমাণীত যে, সুলভ প্রাপ্তি সব সময়ই স্বল্প আবেদনের সৃষ্টি করে। আর স্বল্প আবেদন কখনই দারুন উপভোগ্য বিষয়ের অবতারনা করতে পারেনা। সুগভীর আবেদন সবসময়ই সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। আর সুগভীর আবেদন সৃষ্টি শুধুমাত্র দুর্লভ প্রাপ্তিতেই ঘটে থাকে। একজন বেপর্দা নারী তাৎক্ষনিকভাবে দেহযান্ত্রিক চাঞ্চল্য সৃষ্টির মাধ্যমে আপাতঃ সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হলেও দীর্ঘ মেয়াদী কোন সুগভীর আবেদন ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়না। সেজন্য একজন হিজাবী রমনীই সার্বিক বিচারে সর্বাধিক উপভোগ্য এবং শ্রেষ্ঠতম কল্যানকামী - সৃষ্টিশীল আনন্দ ও সুখ সঞ্চারিনী। অবাধ শরীর-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর ধ্বংস কামী প্রবনতার

ফলশ্রুতিতে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। আর এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার ক্রীড়নক উপাদান হিসেবে আত্মাহুতি দেয় প্রতিশ্রুতিশীল প্রজন্ম - যুবসত্তা। বেশ্যার সাথে যৌনমিলনে তাৎক্ষনিকভাবে উত্তেজনা প্রশমনের তৃপ্তি ঘটলেও দীর্ঘমেয়াদী সুখ তথা আনন্দজনক আত্মতৃপ্তি তাতে ঘটেনা। বরং বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাপ্ত রমনীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংঘটিত সচ্ছন্দ সহবাসের আনন্দ ক্রীড়নক দীর্ঘমেয়াদী সুখ অনুভবের মাধ্যমেই সফল আত্মতৃপ্তি ঘটে। পর্দাহীনতার পরিণতি অবাধ যৌন স্বাধীনতা (Free Sex) আর যৌন স্বাধীনতার বাস্তব ফলশ্রুতি বেশ্যাবৃত্তির সাথেই তুলনীয়। তাই অবাধ যৌনস্বাধীনতা আর নিয়মতান্ত্রিক যৌনাচারের মাঝে আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে পার্থক্য, তেমনি সমাজ নৈতিকতার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্রভাবে এদের প্রভাব সুদুরপ্রসারী ক্রিয়াশীল।

এখন প্রশ্ন হল, পর্দা সিস্টেম কি শুধু নারীদের জন্য? পুরুষরা পর্দা বা হিজাব পরবেনা কেন? আসুন, শরীর, মন ও যৌনবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টির বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষন করা যাক। যৌনক্রিয়ার স্বাভাবিক আসনে 'নর' ও 'নারী' তাদের শারিরীক ও মানসিক সামর্থ্য অনুসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই আসনের ঠিক বিপরীত আসনে নারী তার স্বাভাবিক ক্রিয়া নৈপূন্য প্রদর্শনে সমর্থ হয়না।

একটি অস্বস্তিকর অনিচ্ছাকৃত বিরামহীন সক্রিয়তার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিষ্ক্রিয়তায় নিপতিত হয়। অথচ স্বাভাবিক আসন তথা নারীর উর্ধ্বমুখী আসনে সে যথার্থ এবং কাঙ্খিত সক্রিয়তার মাধমে কুশলের সাথেই গোটা ব্যাপারটিকে পারস্পরিক উপভোগ্য ও প্রানবন্ত করে তোলে। পদ্ধতিগত এই বৈপরিত্য এটাই সপ্রমান করে যে, নারী চরিত্র প্রকৃতিগতভাবেই নর কর্তৃক দলিত-মথিত হওয়ার প্রবণতা বহন করে। নর এর শারিরীক আগ্রাসনের শিকার হতে নারী যেন উন্মুখ থাকে। মানবসত্তা ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী যেমন, হাঁস-মুরগ, গরু-ছাগল ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রেই নারী

> একজন হিজাবী রমনী সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকেই রুচিশীলতা, শালীনতা সর্বোপরি ভালবাসার সুন্দরতম বিনম্র প্রতীক। সুরুচিশীল আধুনিক হিজাবী রমনীর বিনম্র পদচারনা সুগভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাজনক অভিব্যক্তির অবতারনা করে। ফলে শ্রদ্ধাজনক প্রেম ভালবাসার অনুপম সহাবস্থানে সমাজ-সংসার এগিয়ে যায় সুন্দরতম বিকাশের পথে। নারী মানেই রমনীয়। কালো-ধলো প্রতিটি নারীসত্তাই স্বতন্ত্রভাবে আকর্ষনীয়। কিন্তু পর্দাহীন সমাজে নারীপুরুষের অবাধ-উন্মুক্ত সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে নারীদের তুলনামুলক সৌন্দর্য বিচারের ব্যাপক অবকাশ থাকার কারনে হাতে গোনা কজনাই সুন্দরীর মর্যাদা পেয়ে থাকে। বাকীরা হয় অবহেলিতা। পর্দাহীনতার এটিও একটি বাস্তব

চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য ও প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। শারিরীক আগ্রাসন নর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নারী কর্তৃক ব্যতিক্রম ছাড়া আগ্রাসনের আশংকা নেই। দ্বিতীয়তঃ 'নারী' দেহকে এক অনুপম বিমুগ্ধ কোমলতা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নরদেহ একপ্রকার কাঠিন্য দিয়ে যেন তৈরী। এজন্য একজন পুরুষ তাৎক্ষনিকভাবে নারীর মানসিকতায় চরম কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা। তৃতীয়তঃ লজ্জাশীলতা নারী চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর লজ্জাহীন প্রবণতা পুরুষ চরিত্রে অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল। চতুর্থত ঃ শারিরীক শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে নারীর চেয়ে পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই শ্রেষ্টত্বের দাবিদার। উক্ত বিষয়গুলো শরীর, মন ও যৌনবিজ্ঞানে বিভিন্নভাবে প্রমাণীত ও স্বীকৃত। সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা নারীর জন্য পর্দা আর পুরুষের জন্য সতর ঢাকা ফরজ করেছেন। নর ও নারী চরিত্রের উল্লেখিত এ বৈশিষ্ট্য গুলোর আনুপাতিকহারে পুরুষের জন্য সতর ঢাকা আর নারীর জন্য পর্দার বিধান পরম সত্তার সর্বাধিক নিরপেক্ষ, যথার্থ এবং বৈজ্ঞানিক ও সর্বোত্তম বিধান হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। মানব বৈশিষ্ট্যের কোন ঘাটতি না থাকলে কোন মানব সত্তাই এ প্রাকৃতিক সত্য বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারেনা।

কুফল। পর্দা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেলে সমাজের সকল রমনীই পুরুষের কাছে মোহনীয় রূপে ধরা দেবে। কৃত্রিম সাজ গোজের মাধ্যমে পুরুষদের আকর্ষন কুড়োবার প্রয়োজন পড়বেনা।

একজন হিজাবী রমনী সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকেই রুচিশীলতা, শালীনতা সর্বোপরি ভালবাসার সুন্দরতম বিনম্র প্রতীক। সুরুচিশীল আধুনিক হিজাবী রমনীর বিনম্র পদচারনা সুগভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাজনক অভিব্যক্তির অবতারনা করে। ফলে শ্রদ্ধাজনক প্রেম ভালবাসার অনুপম সহাবস্থানে সমাজ-সংসার এগিয়ে যায় সুন্দরতম বিকাশের পথে। নারী মানেই রমনীয়। কালো-ধলো প্রতিটি নারীসত্তাই স্বতন্ত্রভাবে আকর্ষনীয়। কিন্তু পর্দাহীন সমাজে নারীপুরুষের অবাধ-উন্মুক্ত সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে নারীদের তুলনামুলক সৌন্দর্য বিচারের ব্যাপক অবকাশ থাকার কারনে হাতে গোনা কজনাই সুন্দরীর মর্যাদা পেয়ে থাকে। বাকীরা হয় অবহেলিতা। পর্দাহীনতার এটিও একটি বাস্তব কুফল। পর্দা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেলে সমাজের সকল রমনীই পুরুষের কাছে মোহনীয় রূপে ধরা দেবে। কৃত্রিম সাজ গোজের মাধ্যমে পুরুষদের আকর্ষন কুড়োবার প্রয়োজন পড়বেনা। নারী সমতার জন্য সংগতকারনেই পর্দা প্রথার বিকল্প নেই। পর্দাহীনতাই নারীর সম্মান এবং স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। সকল দিক থেকেই নারীকে বিপদের সম্মুখিন করে তোলে। অন্যদিকে পর্দা ব্যবস্থা নারীকে দেয় ব্যাপক স্বাধীনতা, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের গ্যারান্টি, মুক্ত বিচরনের নিশ্চয়তা। সুতরাং পর্দা ব্যবস্থা যে নিসর্গের সাথে

সুসমঞ্জস এবং ভারসাম্যময় একটি নির্ভেজাল প্রাকৃতিক পদ্ধতি, এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। প্রগতিশীল জীবনের প্রয়োজনেই হিজাব পদ্ধতি জীবনের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ।

মাসিক মদীনা, জুন '৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মানব সৃষ্টিঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানব সত্তার সৃষ্টির 'কারণ' হচ্ছেন পরম সত্তা আল্লাহ। কিন্তু মানব সত্তা সৃষ্টির কার্যকারণ কি অর্থাৎ কোন আন্তঃপ্রেক্ষিত কারণের জন্য পরমসত্তা কর্তৃক মানবসত্তা সৃষ্টির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সে প্রাসঙ্গিক নয় বরং সৃষ্ট মানবসত্তার সৃষ্টি জনিত দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই মূলত এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পরম সত্তা কতৃক প্রদত্ত বিশ্বজনিন শাশ্বত সংবিধান আল কুরআনে এ প্রাসঙ্গিক ঘোষণা হলোঃ "আমি (আল্লাহ) জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য" (আয যারিআতঃ ৫৬)।

উক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিঘোষিত হয়েছে -"আল্লাহর ইবাদাত"। 'ইবাদাত' শব্দটি এসেছে "আবদ' শব্দ থেকে। আবদ অর্থ হচ্ছে 'গোলাম' আর ইবাদত মানে হচ্ছে 'গোলামী'। আবদ এর কাজ হচ্ছে ইবাদাত অর্থাৎ গোলামের কাজ হচ্ছে গোলামী করা। সুতরাং পরমসত্তা শুধুমাত্র তাঁরই নিরংকুশ গোলামীর জন্যই মানব সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নয়। আর এ গোলামী কোন একক বা নির্দিষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট নয় কিংবা নয় স্বল্প মেয়াদী বরং এ গোলামী মানব সত্তার সামগ্রিক জীবনের (অবশ্য সচেতন অনুভূতি, বোধ ও প্রজ্ঞার সূচনা হতে) সার্বিক ও সার্বক্ষণিক বস্তু ও বিষয় সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি সক্রিয় চেতনা, কার্যকর তথা সিদ্ধান্তকর প্রতিটি চিন্তা এবং এর প্রেক্ষিত আচরণ তথা কর্মসম্পাদন সবকটি ক্ষেত্রেই এ গোলামীর বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কেননা কোন একটি সত্তার ইবাদত বা গোলামীর বাস্তব পদ্ধতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সে-ই প্রভূ সত্তার আইন মেনে চলা। আর নিরঙ্কুশ গোলামী অবশ্যই আংশিক বা খন্ডিত কোন বিষয় সাপেক্ষ বা সংশ্লিষ্ট হতে পারেনা বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তা পরিব্যাপ্ত-স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বিক আনুগত্য পূর্ণ। কোন একটি দিক ও বিভাগে কোন ভাবেই ভিন্ন কোন সত্তা, বস্তু বা বিষয়কে শেয়ার বা অংশ দেয়া যাবে না। এটাই হচ্ছে নিরঙ্কুশ গোলামীর বাস্তব ও সঠিক ধারণা।

পরম সত্তার সৃষ্ট এবং ইচ্ছা ও কর্মে স্বীকৃত সীমাবদ্ধ স্বাধীন সীমানাধীন মানব সত্তার নিরঙ্কুশ গোলামীর উদ্দেশ্যেই মুলত মানুষের সৃষ্টি। কেননা সমগ্র

বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে পরমসত্তা হতে এবং তাঁরই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজাগতিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ গোটা বিশ্বে তাঁরই আইন কার্যকর রয়েছে। একক ও নিরঙ্কুশ শাসক সত্তার বিধান কার্যকর থাকার প্রেক্ষিতেই বিশ্বজাগতিক প্রক্রিয়ার বিবর্তণ ও বিকাশে কোন বিশৃংখলা ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিটি অনু পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুই পরম সত্তার নির্ধারিত বিধান বাধ্যগতভাবেই মেনে চলছে অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহর ইবাদতে অব্যাহত ভাবে মশগুল রয়েছে। এসবের কোন স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি না থাকার কারণেই এসব জবাবদিহীর আওতামুক্ত- পুরস্কার বা শাস্তি এসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে মানুষ পরমসত্তা প্রদত্ত সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি ভিত্তিক সত্তা হওয়ার প্রেক্ষিত কারণে স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ায় ইহকালীন জীবন পরিচালনার ইখতিয়ার রাখে। সংগতকারণেই মানবজাতির ইহজীবনিক প্রক্রিয়া জবাবদিহীমুলক। মানবসত্তা স্বেচ্ছায় পরমসত্তা ও তাঁর দেয়া শাশ্বত বিধানকে অস্বীকার করতে পারে আবার মেনেও চলতে পারে। 'বিশ্ব প্রকৃতিতে কার্যকর রয়েছে আল্লাহর আইন, - 'সামগ্রিকভাবে মানবজাতি যখনই আল্লাহর আইন মেনে চলবে তখনই তা হবে বিশ্ব প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature) এর সাথে সংগতিশীল, সামঞ্জস্যশীল এবং সমান্তরাল। আর যখনই এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হবে অর্থাৎ মানবজাতি আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ মানব প্রসূত মতবাদের অনুসরণ করে চলবে তখনই তা হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক ও ভারসাম্যহীন। দেখা দেবে বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও অশান্তি। কারণ একক স্রষ্টার সৃষ্টি জগতে পরস্পর বিরোধী আইন কার্যকর বা ফলপ্রসূ হতে পারে না। বিশ্বজগত ও মানবজাতির স্রষ্টা সার্বক্ষণিক ভাবেই তাঁর সৃষ্টির জন্য সার্বিক ভাবে কল্যাণ কামী। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে কোন বিশৃংখলা, অশান্তি ও বিপর্যয় তিনি বরদাশ্‌ত করেন না। সেজন্যই পরমসত্তা পরম অভিজ্ঞার মাধ্যমেই প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান মানুষের জন্য পেশ করেছেন। আর এটাই হচ্ছে কালোত্তীর্ণ বিশ্বজনিন জীবনাদর্শ আল ইসলাম।

মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব সমাজে জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতনের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। আবার মানুষের স্বীয় ক্ষতিকর প্রবণতা বা নফ্‌স তাকে স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী করে তোলে। ভুলুণ্ঠিত হয় পারস্পরিক অধিকার, বিঘ্নিত হয় ন্যায়বিচার, সাম্য ও শিষ্টাচার। দেখা দেয় মানবিক বিপর্যয়। ধ্বসে পড়ে সভ্যতার ইমারত। শুধুমাত্র আল্লাহর গোলামীর বাস্তব স্বীকৃতির মাধ্যমেই মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম হতে পারে। এক ও লাশারীক আল্লাহর নিরংকুশ গোলামী বা আনুগত্যের মাধ্যমেই বিশ্বে সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পরম ও একক সত্তার সার্বিক গোলামীর মাধ্যমেই মানব সত্তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক উন্নতি ও প্রগতি সুনিশ্চিত ও স্থিতিশীল হতে পারে।

উপরোক্ত প্রেক্ষিত কারণ সমূহের জন্যই পরম সত্তা তাঁর সৃষ্ট মানব জাতিকে ইহজীবনের সকল ক্ষেত্রে (চিন্তা-চেতনা-কর্ম ও আচরণ এবং উপাসনা) শুধুমাত্র তাঁরই গোলামীর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এর উপযোগী জীবন ব্যবস্থা সম্বলিত জীবনবিধান দিয়েছেন যার নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। এই ইসলামী জীবনাদর্শের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য বা গোলামী হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলা কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব যদি ব্যক্তিসত্তা পার্থিব জগতের যেসব ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত অর্থাৎ যেসব দিক ও বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বা কোন না কোন ভাবেও সম্পর্কিত তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসর সকল ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটাই হচ্ছে শর্ত। কিন্তু এটা কি সম্ভব বা বাস্তব যে, সর্বত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর মানব

সত্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বিঘ্নে আল্লাহর গোলামী করে যাবে? অবশ্যই না। কারণ মানুষের রয়েছে ইচ্ছা ও কর্মশক্তির 'ব্যাপক স্বাধীনতা'। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির একই সাথে আল্লাহর গোলামীর স্বীকৃতি স্বরূপ ইসলামী জীবনাদর্শ কবুল করে নেয়া একটি অবাস্তব ব্যাপার। সুতরাং বলা যায় বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলা সম্ভব নয়-খন্ডিত বা আংশিকভাবে সম্ভব হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় এই আংশিক গোলামীর মাধ্যমে কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হতে পারে? মানবসত্তা কি নিরংকুশ গোলামীর দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে? মানব সত্তার সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ কি সম্ভব? যৌক্তিক জবাব হচ্ছে- অবশ্যই না। তাহলে উপায় কি?

মহা গ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। সুরা আল বাকারায় আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, পৃথিবীতে মানুষকে তিনি তাঁর খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন (আয়াত নং ৩০)। খলিফা মানে হলো 'প্রতিনিধি'। আর প্রতিনিধির কাজ হলো যে সত্তার পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বশীল হয়েছে হুবহু সেই সত্তার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালান। আর আল্লাহর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মানব সত্তা সার্বিকভাবে তাঁর গোলামী করুক অর্থাৎ তাঁরই আইন মেনে চলুক। সুতরাং খলিফার কাজ হলো- "নিজে সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহর আইন মেনে চলার সংগ্রামী ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবে এবং সার্বজনিন ভাবে আল্লাহর আইন মেনে চলার বাস্তব ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজনে রাষ্ট্র ও সমাজ তথা সারাবিশ্বে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে"। আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বা চূড়ান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলার বাস্তব চর্চাবৃত্তিক অভ্যাস গড়ে উঠে, প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধা অপসারিত হয় এবং সর্বোপরি আইন প্রণেতার কাছে জবাবদিহীর সুযোগ বা অনুকূল প্রেক্ষিত তৈরী হয়। সুতরাং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমেই আল্লাহর নিরংকুশ গোলামীর বাস্তব পরিবেশ বা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং শুধুমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই সার্বিক গোলামীর হক আদায় হতে পারে অন্য কোন তরিকা বা পদ্ধতি কিংবা অজুহাতের মাধ্যমে নয়। এটাই হচ্ছে খিলাফতের যথার্থ ও সঠিক ধারণা। মানবসৃষ্টির মৌল উদ্দেশ্য হাসিল তথা আল্লাহর নিরংকুশ গোলামীর একমাত্র লক্ষ্য পথই হচ্ছে এই খিলাফত। কুরআন ও হাদিসে খিলাফত প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজকে ব্যাপকভাবে "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" তথা আল্লাহর পথে সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে - "আল্লাহর উপর ঈমান আনো, রাসুলের উপর ঈমান আনো এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো। এটাই তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ যদি তোমরা বুঝতে সক্ষম হও।" (সূরা আস সফঃ ১১)। আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান

আনার সাথে সাথেই ঈমানী জীবনের অনিবার্য কর্মসূচী বা কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করা হয়েছে জিহাদ বা সংগ্রাম। কারণ সংগ্রাম বা আন্দোলন ছাড়া ঈমানের ঘোষণা মোতাবেক জীবন যাপন করা কার্যত অসম্ভব। বস্তুত ঈমানের অনিবার্য কর্মসূচীই হচ্ছে জিহাদ (জিহাদ অর্থ যুদ্ধ নয় বরং আভিধানিকভাবে এর অর্থ চূড়ান্ত বা আপ্রাণ প্রচেষ্টা। 'যুদ্ধ' জিহাদের সর্বশেষ পর্যায় বা স্তর। অগণতান্ত্রিক পরিবেশে যার কোন বিকল্প থাকে না) আর জিহাদের ফলশ্রুতিই হচ্ছে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মানব সৃষ্টির মৌল উদ্দেশ্য আল্লাহর গোলামী হাসিল খিলাফতের লক্ষ্য অর্জন ছাড়া কোন ভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। খিলাফতই হচ্ছে ইবাদতের রক্ষাকবচ। খিলাফতের দায়িত্ব পালন যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের নামই যেহেতু ইবাদাত সুতরাং খিলাফতই হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত, যা অন্যান্য সকল ইবাদাতকে নিশ্চিত করে। মুমিন মানেই মুজাহিদ। ঈমানের পরিনতিই হচ্ছে জিহাদী জীবন। নিজের নফ্স থেকে শুরু করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর আইন মেনে চলার বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য তাকে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম চালাতে হয়। আল্লাহর খলিফা হিসেবে এটিই তার কাজ। সুতরাং খিলাফতই হচ্ছে ইবাদাতের চারণভূমি। মুমিন সত্তার উদ্দেশ্যই হলো পরম সত্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের একমাত্র পথই হলো আল্লাহর পথে সংগ্রাম। সুতরাং খিলাফত প্রতিষ্ঠাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য- প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করছে মানব জীবনের পার্থিব ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ (সূত্রঃ আস সফঃ ১০-১৩) "হে ইমানদারগণ, তোমাদের কি হয়েছে? যখন তোমাদেরকে বলা হয় বেরিয়ে পড়ো আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্য তোমরা তখন যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাকো; তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাও? ..... তোমরা যদি বের না হও তোমাদের ভয়ানক কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।" (আত্তাওবাঃ ৩৮-৩৯)। "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে চুড়ান্ত সংগ্রাম করে (প্রয়োজনে) মারে এবং মরেও।" (আত্তাওবাঃ ১১১) "তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, অতঃপর কেউ যদি বেঈমানী করে তবে সে নিজেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সুরা ফাতিরঃ ৩৯)। সুতরাং আল্লাহর আইন মেনে চলার উপযোগী ও সহায়ক বিশ্বব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশ্বব্যাপী আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্পনেই। এ পথেই সম্ভব মানব জাতির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ এবং বিশ্বব্যাপী সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

মাসিক পৃথিবী, ডিসেম্বর '৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মুক্তবুদ্ধির চর্চা বনাম জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

মুক্তবুদ্ধি চর্চা সার্বক্ষণিকভাবেই ভাল যতক্ষন পর্যন্ত তা নেতিবাচক ইতিবৃত্তে আবর্তিত না হয়ে ইতিবাচক পরিবৃত্তে প্রতিনিয়ত প্রগতিশীল থাকে। মুক্তিবুদ্ধিজাত ইতবাচক রূপটি যেমনি শুভ-সুন্দরতম জনগণমানসিকতার পরিচায়ক তেমনি এর নেতিবাচক রূপটি সার্বজনিন সুন্দর মানসিকতা পরিহারী এক অনভিপ্রেত সর্বগ্রাসী পরিণতি লাভ করে। সৃজনশীলতার ক্রম বিলুপ্তির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বংসকামী মারাত্মক জীবানুর বিস্তার ঘটায় যা নির্দিষ্ট এক পর্যায়ে মানবতার নৈসর্গিক অবকাঠামোকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। ব্যক্তিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশ সত্য সুন্দর প্রগতিশীল না হয়ে লাগামহীনতায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। মানবিক ও রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বিজাতীয় শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে। স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে এ জাতীয় নৈতিবাচক অবাধ বুদ্ধির চর্চা কল্যানকর বা প্রগতিশীল ইস্যু ভিত্তিক না হয়ে ক্রমান্বয়ে আপাতঃ অদৃশ্য একটি সুনির্দিষ্ট অনির্দিষ্টের পথে অভিযাত্রী হয়। ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা আর বিজাতীয় চেতনায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে বিপন্ন জাতীয় মানসিকতা; ধ্বসে পড়ে ঐতিহ্যবাহী জাতীয় মূল্যবোধের অবকাঠামো। প্রগতিশীলতার অন্ধ আকর্ষণে জাতি ধাবিত হয় নির্দিষ্ট পতনাভিমুখে। অনিবার্য অস্তিত্ব বিনাশী এই অশুভ পতন নেতিবাচক মুক্তবুদ্ধি চর্চার উর্বর মস্তিষ্ক হতেই ফলিত যা একান্তই চির অশান্তি, হতাশা, হিংসা, দ্বেষ আর পরাধীনতার ধারাবাহিক পরিণতিবাহী। পক্ষান্তরে ইতিবাচক মুক্তবুদ্ধি চর্চা সংগত কারণেই সুন্দরতম ইস্যু ভিত্তিক; শাশ্বত কল্যাণকামী। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সদা প্রক্রিয়াশীল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জাত জাতীয় মূল্যবোধে সমৃদ্ধ উদারনৈতিক ইতিবাচক আধুনিক গতিময়তা যা বাস্তবিক অর্থেই প্রগতিশীল। সত্য ও সুন্দরের বিকাশ ও প্রকাশে তথা জাতীয় উন্নতি প্রগতির নিমিত্তে এটিই মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুন্দরতম বলিষ্ঠ ফলপ্রসুধারা।

জাতীয় উন্নতি প্রগতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুমহান দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাঁরাই হচ্ছেন সম্মানীত জাতীয় বুদ্ধিজীবী। তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ তাঁদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক ফলশ্রুতিই হচ্ছে জাতীয় মানসিকতার পরিচায়ক। জাতীয় ঐক্য, শান্তি, সংহতি, সম্প্রীতি তথা উন্নতি প্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। এরাই হচ্ছেন জাতির বিবেক। সুতরাং তাঁদের ভূমিকা যদি হয় অনৈক্য প্রয়াসী, বিভেদকামী, সহিংস অথবা সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণ বাদ কিংবা আধিপত্যবাদ সেবী তবে তা জাতীয় প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় তো বটেই এমনকি তা জাতীয় অস্তিত্ব-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যেও মারাত্মক হুমকির অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইতিবাচক বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে নেতিবাচক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা প্রবনতা যেন অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত। মুক্তবুদ্ধি চর্চা যদি প্রকৃত অর্থেই দেশ ও জাতির কল্যানার্থে হয়ে থাকে তবে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির দাবিদার 'প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী' মহলের বাস্তব ভূমিকা কতটুকু ইতিবাচক এবং সৃজনশীল তা উপলব্ধি করা বাস্তবিকই দূর্বোধ্য। কেননা বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশে স্বাধীনতা লাভের পচিশ বছর পরেও রাজনৈতিক মত পার্থক্যে অতীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রক্রিয়া বিরোধী বলয়ে অবস্থানের প্রেক্ষাপটকে সার্বক্ষণিক এবং সর্বকালীন স্বাধীনতা বিরোধী রূপে আখ্যায়িত করা কতটুকু মুক্তবুদ্ধির দাবী রাখে সেটাই বিবেচ্য। কেননা তথাকথিত স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অবস্থানের রয়েছে অনেকগুলো যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা। বিরোধী বলয়ে অবস্থানের পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল ছিল শক্তিশালী যৌক্তিক ভিত্তি বা কারণ যা অন্ধ আক্রোশ, ভাবাবেগ কিংবা হঠকারী বক্তব্য ছাড়া মুক্তবুদ্ধি বৃত্তিক পন্থায় যৌক্তিকভাবে আজও খন্ডন করা যায়নি। ঘন জনসমৃদ্ধ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ প্রশ্ন জাতীয় উন্নতি প্রগতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক তো নয়ই বরং জাতীয় ঐক্য সম্প্রীতি বিনাশী সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র হিসেবেই একে অভিহিত করা উচিত। তাছাড়া কথিত স্বাধীনতা বিরোধীরা যদি জাতীয় স্বার্থে সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে রাজনৈতিকভাবে তাদের মুকাবেলা না করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নির্মুল অভিযান পরিচালনার জন্য নির্মুল কমিটি গঠন, কার্যক্রম অনুমোদন, সর্মথন, প্রেরণা দান কিংবা উস্কানি প্রদান অথবা ক্ষমতার হিংসাত্মক প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের অপব্যবহার কি ন্যুনতম যৌক্তিকতা ও নীতিবোধের দাবী রাখে ? এটা কি গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি নয় ? আর এ জাতীয় প্রক্রিয়া সমর্থন কি আদৌ মুক্ত বুদ্ধি বৃত্তির দাবী সংরক্ষণ করে? করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে এ জাতীয় বিভক্তি চর্চা ভয়াবহ - মারাত্মক পরিনতির ইঙ্গিতবাহী নয় কি? স্বাধীনতা

ও সার্বভৌমত্ব কি হুমকির সম্মুখীন নয়? আমাদের সম্মানীত বুদ্ধিজীবীদের এ বিষয় গুলো যত্নের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

অন্যদিকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তান এবং ইসলামকে একাকার করে ফেলা হয় এবং পাকিস্তান বিরোধীতার নামে ইসলামী তাহজিব ও তমদ্দুনকে মুছে ফেলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় খুবই দুঃখজনকভাবে। ৯০% মুসলমানের এই দেশে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জঘণ্য প্রয়াস চালান হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলের সাথে। শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আজ আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের শিকার। আর এই আগ্রাসী তৎপরতার সহায়ক সক্রিয় শক্তি হিসেবে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী উদার সংস্কৃতি চর্চার নামে আমাদের দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর মূল্যবোধের পিঠে নির্বিচারে চালাচ্ছেন ছুরি। অথচ এই তথাকথিত উদার সংস্কৃতি চর্চার পরিনাম যে কি ভয়াবহ এবং আত্মঘাতী তা ক্ষণিকের জন্যেও তাঁরা চিন্তা করেন বলে মনে হয় না। অথচ আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সভ্যতা যদি ওপারের সাথে একাকার হয়ে মিশে যায় তবে মাঝখানের ঐ ভৌগলিক সীমারেখা টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা থাকবে কি? সময় থাকতে আমরা যদি সতর্ক না হই তবে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাবদিহী করতে সক্ষম হব? সুতরাং 'মংগল প্রদীপ' নয় এদেশের বৃহত্তর মানবতার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর জীবনাদর্শই আমাদের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র গ্যারান্টি।

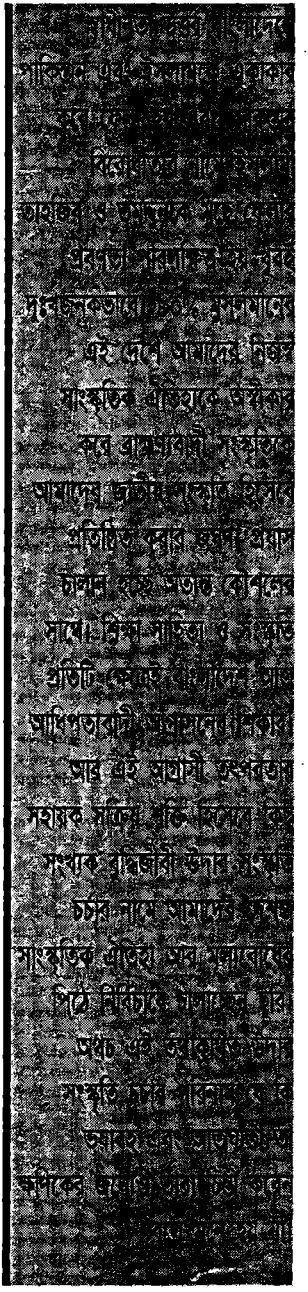

এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী আছেন যারা নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দাবী করেন অথচ তারাই আবার ধর্মের উপর ষ্টীম রোলার চালাতে চান। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী জানান। এটা স্পষ্টত স্ববিরোধীতা। অথচ ধর্ম কোন মানসিক বিষয় বা নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার নয় বরং ধর্ম হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শের অধীনে জীবন পরিচালনার নাম বা আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। বিশ্বাস এবং আচরণে যা সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিকৃতিহীনতা, ত্রুটিহীনতা, স্বচ্ছতা ও পূর্ণাঙ্গতা। এবং সর্বোপরি আইনগত বিধি বিধান বা শরীআত। একমাত্র ইসলামই হচ্ছে এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা কালজয়ী ও প্রগতিশীল। রাজনীতি বা রাষ্ট্রক্ষমতা যার অনিবার্য শর্ত। ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এর ইতিহাস সুস্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে ছিল যার সাম্রাজ্য বিস্তৃত। ইসলামের নবী (সাঃ) নিজেও ছিলেন তৎকালীন মদীনা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সুতরাং ইসলাম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেখার কোন অবকাশ আছে কি? আর এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া কি ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতার অস্বীকার নয়? ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী অবশ্যই ধর্মবিরোধীতা এবং এটা মৌলিক অধিকার হরণের পর্যায়ভূক্ত বিধায় অবশ্যই অগণতান্ত্রিক। সুতরাং এজাতীয় অন্যায় ও অযৌক্তিকদাবী, কোন ভাবেই মুক্তবুদ্ধি চর্চার ফলশ্রুতি হতে পারেনা। বিশেষ করে যে দেশে ৯০% জনগণ মুসলমান সে দেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের যে কোন অপপ্রয়াস চরম ধৃষ্টতার শামীল বলেই গণ্য হবে।

আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী- যারা আধুনিকতা আর প্রগতিশীলতার নামে বর্বরতা আর বেহায়াপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাচ্ছেন। শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দক্ষতার সাথে সক্রিয় রেখেছেন মানবতা বিধ্বংসী তথাকথিত মানবতাবাদী একদেশদর্শী বস্তুবাদ চর্চা। মুক্ত বুদ্ধি চর্চার দাবীদার এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীমহল কথিত সাম্যবাদী শ্লোগান মুখর প্রাবন্ধিক থিয়োরীতে বিশ্বস্ত থেকে দারুণ বস্তুবাদের কৌশল সক্রিয় প্রচার ও প্রসারে আত্মনিবেদিত অথচ বাস্তবক্ষেত্রে বস্তুবাদী আদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পতন বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে সুপ্রমানীত। তথাকথিত মানবতাবাদী কম্যুনিষ্ঠ দেশ গুলোতে তাঁদের সেই স্বাপ্নিক মানবতাবাদের কবর রচিত হয়েছে- ঢল নেমেছিল বার্লিন প্রাচীরভেদী বস্তুবাদী নাগপাশ হতে মুক্তিকামী কোটি জনতার। কারণ তথাকথিত সমবন্টনের ঐন্দ্রজালিক মোহ সৃষ্টি করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আজন্ম লালিত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করে জনগণের উপর স্বৈরাচারী ষ্টীম রোলার চালান, পুঁজিবাদ খতমের নামে একদলীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটান কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিল্পবকে 'প্রতিবিপ্লব' রূপে দমন করা আর যা-ই হোক মুক্তবুদ্ধির আলোকে ইতিবাচক বা কল্যাণকর বলা যেতে পারেনা। কারণ প্রকৃত মুক্ত বুদ্ধি চর্চার দাবী

হচ্ছে এই- আপাতঃ লোভনীয় বেশ্যার জঘন্য সুন্দর দেহ সুতীব্র কামোত্তেজনার প্রবল আসক্তি জাগালেও তার সাথে মিলিত হওয়া যায় না। তাকে ভালবাসা যায় না। কেননা সেই জঘন্য সুন্দর দেহের পরতে পরতে জেগে থাকে মারাত্মক জীবানু। যেহেতু কাম সাময়িক আর ভালবাসা স্থায়ী আবেদনে সমৃদ্ধ সুতরাং আপাতঃ সমবন্টনের কামোত্তেজনায় পীড়িত প্রগতিশীলতা কিংবা প্রতিবেশী দুর্দান্ত যুবকটি বিয়ে ভেংগে দেবে এই ভয়ে ভীত যুবতীর বিনা বাধায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়া অথবা "ভালবাসায় মরে যাই, লজ্জায় কিছু বলতে পারিনা বাঁধা দিতে পারি না" এ জাতীয় আধিপত্যবাদসেবী সংস্কৃতি চর্চা নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতিকে ভয়াবহ পরিণতির দিকেই নিয়ে যাবে। অতএব সংগত কারণেই মুক্তবুদ্ধি চর্চা হোক শাশ্বত জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ সুন্দর স্বদেশ আর প্রাণময় পৃথিবী গড়ার জন্য।

স্বাধীনতার স্বরূপ

ও চেতনাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

স্বরূপঃ 'স্বাধীনতা' শব্দটির সরাসরি বিশ্লেষণ হলো স্ব-অধীনতা অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকা, পরের অধীনে না থাকা। শব্দটির বিশ্লেষনী অর্থগত দিক থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, স্বাধীনতার অর্থ কোনভাবেই বন্ধনমুক্ত থাকা, নিয়ন্ত্রনহীনতা অথবা অধীনতা বা গোলামী মুক্ত থাকা বুঝায় না। বরং এর সুস্পষ্ট মানেই হলো গোলামী বা অধীনতার স্বীকৃতি। আর এগোলামী বা অধীনতা হচ্ছে একান্তভাবেই নিজের অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে বা অধীনে থাকা। সোজা কথায় যা দাঁড়ায়, তাহলো ব্যক্তিসত্তা যা ইচ্ছে তা-ই করবে, যা ইচ্ছে তা-ই ভোগ করবে। কোন বাঁধন, কারও আনুগত্য সে মানবেনা। শুধু তার নিজের মনে যা ভাল লাগবে তা-ই সে করবে। স্বাধীনতা শব্দটির সরাসরি শাব্দিক এ অর্থগত দিক থেকে একজন ব্যক্তিকে বল্গাহীন একটি অশ্বের সাথেই তুলনা করা চলে, যে অশ্বটি তার সামনে যে শস্যক্ষেতই দেখতে পায় তাতেই ঢোকে পড়ে শস্য খেয়ে ফেলে এবং তছনছ করে দেয়। একজন ব্যক্তিসত্তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি এভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে যায় তাহলে নৈতিক জীবনের কোন ভিত্তিই আর টিকে থাকবে না। এ স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে পশুজনিন। অথচ মানুষ হচ্ছে নৈতিকসত্তা। নৈতিকতাই তার প্রাণ। স্বাধীনতার উল্লেখিত এ অর্থটি স্পষ্টতই নেতিবাচক। এজন্য নীতি বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-এ স্বাধীনতার এ অর্থটি গৃহীত হয় না। স্বভাবগতভাবেই মানুষের নফ্স বা সত্তা তার কামনা বাসনাকে তথা খাহেশাতকে পূরণ করার জন্য উদগ্রীব থাকে। সে জন্যই ইচ্ছা ও কাজের নিরংকুশ স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে যাবতীয় অন্যায়, পাপাচার ও জুলুমের বৈধতা স্বীকৃত হতে বাধ্য। এ জন্য স্বাধীনতার ইতিবাচক রূপ হলোঃ ব্যক্তিসত্তা নিজকে একটি আদর্শনৈতিকতার অধীনে পরিচালনা করবে অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকার অর্থ হবে নিজের জন্য গৃহীত প্রিয় আদর্শিক

নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন করার মাধ্যমে আপন ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটান। এক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা নিজকে আদর্শের বাস্তব প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞান করবে। নেতিবাচক স্বাধীনতা অর্থাৎ আদর্শনৈতিকতা বিহীন জীবন যাপন ব্যক্তিসত্তাকে অকল্যাণ ও ধ্বংসকামীতায় পরাধীন করে তোলে। সীমাহীন প্রাপ্তির নেশা ও লোভ তাকে ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত করে। এভাবেই সে স্বাধীনতা হারিয়ে পুণরায় পরাধীন হয়ে পড়ে। সুতরাং সংগত কারণেই ব্যক্তি স্বাধীনতা অবশ্যই শর্তহীন নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার সামষ্টিক বা জাতীয়রূপ হলো 'জাতীয় স্বাধীনতা'। ব্যক্তিসত্তা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক চাহিদা ও মানবীয় দিক অক্ষুন্ন রেখে জাতীয় স্বাধীনতায় বিলীন হয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পরস্পর সম্পুরক। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং বিকাশ ঘটায়। অন্য দিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ, স্থিতিশীল ও সুসংহত করে। অধ্যাপক লাস্কি যথার্থই বলেছেন "স্বাধীনতা বলতে আমি সেই পরিবেশ সযত্নে সংরক্ষণ করাই বুঝি যেখানে মানুষ তাদের সত্তাকে সর্বোত্তম ভাবে বিকশিত করার সুযোগ লাভ করে।"

চেতনাঃ স্বাধীনতা মানব সত্তার মৌলিক ও সহজাত আকাংখা। সার্বক্ষনিকভাবেই মানুষ স্বাধীনচেতা। পরিবেশ-পরিস্থিতিগত কারণে কোন ব্যক্তি স্বল্পস্বাধীন বা পরাধীন থাকলেও মানসিকভাবে সে তার স্বাধীনতা বোধকে বিসর্জন দিতে পারে না। এই একান্ত স্বকীয় ও সহজাত অনুভূতি চেতনার প্রতিটি স্তরে সযত্নে লালিত হয়। বিকাশের সুযোগ্য পরিবেশ বা অবকাশ পেলে তা আর অবদমিত থাকে না। অবশ্য অব্যাহত দীর্ঘমেয়াদী পরাধীনতার কারণে চেতনার সেই স্তর গুলো খুবই দূর্বল হয়ে পড়ে। তখন স্বাধীনতার এই বোধ মানুষের সচেতন মন থেকে অবচেতন মনে এবং ধীরে ধীরে অবচেতন মন থেকে সরাসরি অচেতন মনে হারিয়ে যায়। এভাবে এই 'বোধ' এর বিলুপ্তি ঘটে। অবচেতন মনে নির্জীব, নিষ্ক্রিয় ও লুপ্ত প্রায় এ বোধকে অব্যাহত ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় তথা মানসিকতার উত্থান পতনের মাধ্যমে চৈতন্যে নিয়ে আসা সম্ভব। এবং এখানেই এই বোধ অব্যাহত ঘটনা প্রবাহে শক্তি সঞ্চয় করে চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে সচেতন মনে সুদৃঢ় অবস্থান নেয়। এভাবেই সচেতন মনের সার্বিক ক্রিয়াশীলতায় চেতনার ব্যাপক বিকাশ ঘটে এবং একটি অনিবার্য বিপ্লবের জন্য সকল দিক থেকেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ব্যক্তিগত এ চেতনার সামষ্টিক রূপ হয় জাতীয় -ভিত্তিক চেতনার ঐকমত্য। নিয়মতান্ত্রিক পথেই স্বাধীনতার ঘোষনা ও আন্দোলন চলতে থাকে। অবশেষে যখন নিয়মতান্ত্রিক সকল পথই বন্ধ হয়ে যায় তখন এই চেতনা বিদ্রোহে রূপ নেয়- শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। স্পষ্টতই স্বাধীনতা বোধ থেকে জাগ্রত চেতনার ধারাবাহিকতার নিয়মতান্ত্রিক ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, যুদ্ধচলাকালীন ঘটনাবলী, বিজয়ের পরবর্তী অবস্থা ইত্যাদির দিকে নজর দিলে যে ঐতিহাসিক সত্যগুলো বেরিয়ে আসে তাহলো - (১) ২৬শে মার্চ '৭১ এর-পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার ইস্যু ও দাবীতে কোন আন্দোলন ছিল না। (২) সরকার পতনের আন্দোলন, ৬ দফা তথা স্বাধীকার বা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামীলীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি আন্দোলন জোরদার ছিল। (৩) এ সবের অধিকাংশ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সহ ইসলামপন্থী অন্যান্য দল গুলোর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল। (৪) '৭০ এর নির্বাচনে জনগণ স্বাধীকারের চেতনায় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আওয়ামীলীগকে নির্বাচিত করেছিল, নির্দিষ্ট কোন ' আদর্শিক চেতনা' বা স্বাধীনতার ইস্যুতে নয় (শেখ মুজিব নিজেও বলেছেন-৬ দফায় এমন কিছু নেই যা পাকিস্তানের অখন্ডতাকে বিনষ্ট করতে পারে বরং ৬ দফা মেনে নেয়া হলে পাকিস্তান বিশ্বের বুকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে) (৫) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কোন একটি ঘটনা বা আন্দোলন দ্বারাও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিরোধীতা করেনি। (৬) স্পষ্টতই নেতৃত্ব তথা শাসকের পরিবর্তন চেয়েছিল। (৭) পরবর্তিতে যা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। (৮) এ সবকটি আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে এবং অধীনেই পরিচালিত হয়েছিল। (৯) শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক স্বাধীনতার ইস্যুতে নয় বরং ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আলোচনার জন্যই হয়েছিল। (১০) শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানীদের সার্বিককল্যাণ তথা মুক্তির জন্য নিরলস কাজ করেছেন, স্বাধীকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন কিন্তু 'স্বাধীনতার'-র প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট ছিল না (স্বাধীকার মানে স্বাধীনতা নয়; স্ব-অধিকার। স্বাধীনতা শব্দটি অনেক ব্যাপক)। (১১) ২৫শে মার্চ পাক বাহিনী হামলা শুরু করে। শেখ মুজিব বন্দীত্ব বরণ করেন। (১২) ২৬ শে মার্চ জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। (১৩) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (১৪) ভারত সক্রিয় সহযোগিতা করে। (১৫) নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। (১৬) ইসলামপন্থী দলগুলো রাজনৈতিক মত পার্থক্যে বিরোধী ব্লকে অবস্থান নেয় (বিশেষ করে ভারতীয় আধিপত্যবাদের আশংকা)। (১৭) ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর প্রধান মিঃ অরোরার কাছে পাকবাহিনীর নিয়াজীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বিজয় সূচিত হয়। (১৮) বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। (১৯) অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের নামে আওয়ামীলীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। (২০) পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে '৭০ ও '৭১ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট

ছাড়াই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক' সংবিধান প্রণয়ন করা হয়.

ঐতিহাসিক এ সত্য বিষয়গুলোর মাধ্যমে যে ক'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হলো- প্রথমত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট কোন 'আদর্শিক চেতনা' ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীকার তথা পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্যের অবসান, শাসকের অপসারণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জনগণ একটি চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের শিকার হয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। এক্ষেত্রে চারটি 'তাৎক্ষনিক চেতনা' তখন ক্রিয়াশীল ছিল (১) বর্বোরচিত হামলার প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা (২) আত্মরক্ষার চেতনা (৩) দেশকে শত্রুমুক্ত করার চেতনা ও (৪) অধিকার আদায়ের চেতনা। এই চারটি বিচ্ছিন্ন এবং তাৎক্ষনিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চেতনার সংঘটিত রূপই ছিল স্বাধীনতার চেতনা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তৃতীয়ত, জনগণ যুদ্ধ করেছে পাক সামরিক জান্তার সাথে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ তথা ইসলাম বা ধর্মের সাথে নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য জনগণ অবশ্যই যুদ্ধ করেনি। জনগণের মতামত গ্রহণ ছাড়াই এটা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মুক্তি যুদ্ধের চেতনা রূপে অভিহিত করা একটি জঘন্য মিথ্যাচারের শামিল। চতুর্থত, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর বদলে মিঃ অরোরার কাছে নিয়াজীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানটি ছিল জন্মলগ্নেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রথম চপেটাঘাত। এ ঘটনাই সপ্রমান করে যে, ভারত বন্ধু হিসেবে নয় বরং তার চিরশত্রু মুসলিম পাকিস্তানকে কোনঠাসা করা, '৬৫-র যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া, বিভক্ত করা এবং বিখন্ডিত অংশে আধিপত্য কায়েমের অসৎ উদ্দেশ্যেই মানবতাবাদী বন্ধু সেজেছিল।

প্রস্তাবনাঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পরও এ দেশের মানুষ মুক্তি লাভ করেনি। রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি কোন ক্ষেত্রেই না। অর্থনৈতিক দৈন্যতা, রাজনৈতিক শূন্যতা-অস্থিরতা, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, পুশইন, তালপট্টি, ফারাক্কা, শান্তি বাহিনীর তৎপরতা এবং সর্বোপরি প্রতিবেশী নির্ভর নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, আইন শৃংখলার চরম অবনতি, অব্যাহত সন্ত্রাস, গণ আদালতের নামে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির বেআইনী কার্যকলাপ, ক্ষুধা দারিদ্র, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও ধর্মের অবমাননা ইত্যাদি পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস। এসব থেকে মুক্তির মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ তথা স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও স্থিতিশীল করার জন্য জাতীয় চেতনার

সঠিক মূল্যায়ন এবং এর প্রেক্ষিত জাতীয় আর্দশ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং মানুষের নফসের অবৈধ চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রাখাই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এমন একটি জীবনাদর্শ প্রয়োজন যে আদর্শ রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল এবং সর্বোপরি জনগণকে তাদের সার্বিক আচরণের জন্য জবাবদিহীর সম্মুখীন করে, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েমের কোন পথই খোলা না রাখে। ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলাম-ই হচ্ছে এরকম ত্রুটিহীন একমাত্র জীবনাদর্শ যা এক অদৃশ্য, চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তার নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করে। পরকালীন বিচার-পুরস্কারের প্রত্যাশা এবং শাস্তির ভয়ে ভীত এবং মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত সাহসী মানুষেরা মিলে গড়ে তোলে এক শক্তিশালী নৈতিক রাষ্ট্র। অন্য কোন আদর্শেই এ গ্যারান্টি নেই। কেননা মানুষের তৈরী প্রতিটি আদর্শই কোন না কোন ভাবে মানুষের উপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেয়। যেমন, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে গোটা দেশ ও জাতি জিম্মি থাকে। পার্টিই সর্বেসর্বা। এর উপর খবরদারী করার কেউ থাকেনা বিধায় জবাবদিহীর কোন অবকাশ ও মানসিকতা থাকেনা ফলে ক্রমেই পার্টি স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে - লংঘিত হয় মানুষের মৌলিক অধিকার। পক্ষান্তরে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলরা জনগণ এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য। সুতরাং ইসলামই হচ্ছে স্বাধীনতার এক মাত্র গ্যারান্টি। এছাড়া, একজন প্রকৃত মুসলিম আদর্শিক

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এমন একটি জীবনাদর্শ প্রয়োজন যে আদর্শ রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল এবং সর্বোপরি জনগণকে তাদের সার্বিক আচরণের জন্য জবাবদিহীর সম্মুখীন করে, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েমের কোন পথই খোলা না রাখে। ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলাম-ই হচ্ছে এরকম ত্রুটিহীন একমাত্র জীবনাদর্শ যা এক অদৃশ্য, চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তার নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করে। পরকালীন বিচার-পুরস্কারের প্রত্যাশা এবং শাস্তির ভয়ে ভীত এবং মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত সাহসী মানুষেরা মিলে গড়ে তোলে এক শক্তিশালী নৈতিক রাষ্ট্র। অন্য কোন আদর্শেই এ গ্যারান্টি নেই। কেননা মানুষের তৈরী প্রতিটি আদর্শই কোন না কোন ভাবে মানুষের উপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেয়।

ভাবেই আপোষহীন এবং ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। সুতরাং ৯০% মুসলমানের এই দেশের জনগণকে ঈমানী চেতনা ও ইসলামী আদর্শের মাধ্যমেই একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল এবং শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

দৈনিক সংগ্রাম বিজয় দিবস সংখ্যা '৯৩-এ প্রকাশিত।

প্রসঙ্গ কুরবানীর আদর্শ ঃ জাতীয় মূল্যবোধ ও জীবনাচরন প্রেক্ষিত

প্রাণময় পৃথিবী; প্রাণবন্ত স্বদেশ। ঈদ-উল-আজহা কুরবানীর ঈদ। ঈদের আনন্দে প্রাণবান প্রতিটি নাগরিক প্রাণ। কেন এ আনন্দ? প্রাণোচ্ছল আনন্দে সারাটি দেশ ও জাতি উল্লসিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাই আনন্দে উদ্বেল। কিন্তু কেন? লক্ষ লক্ষ গরু-ছাগলের রক্ত ঝরিয়ে কি আনন্দ পায় জাতির লোকেরা? তবে কি আমিষে ভরপুর গোমাংসের সীমাহীন লোভ সামলাতে না পারার ফলশ্রুতি এই আনন্দ বেপরোয়া মুসলমানদের গো-প্রাণী বধ?

মুসলমান নামধারী প্রতিটি মানব সন্তাই ঈদের আনন্দ উপভোগ করে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক। উপভোগ আর আনন্দের মাত্রা ও পরিমাণ যাই হোক। ঈদের খুশীতে সবাই খুশী। ঈদের স্রষ্টা ও প্রণেতাকে বিশ্বাস করেন না, মানেন না এমন নগণ্য সংখ্যক বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিরাও ঈদের আনন্দ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না-রাখেন না। যে কোনভাবেই সম্পৃক্ত থাকেন। এটাই বাস্তবতা। ঈদ উৎসব- আমাদের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত আনন্দ উৎসব। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এটি একটি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ। অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বাস্তব প্রেক্ষিতের কারণেই নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিকরাও ঈদের আনন্দ হাইজ্যাক করে থাকেন। ঈদগাহে যান, নামাজ আদায় করেন (ফজরের ফরজ নামাজ কাযা রেখেই), কোলাকুলি করেন, শুভেচ্ছা জানান, বিবৃতি দেন, ঈদ পূনর্মিলনীতে যান।

ঈদ উৎসব দু'টি। ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আজহা। ঈদুল ফিতরে আনন্দ উপভোগের বাহ্যতঃ যৌক্তিক দিক রয়েছে। যেমন দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পেটপুরে খাওয়ার এবং কামনার স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভোগ ইত্যাদির সময় সাপেক্ষ নিষিদ্ধ ঘোষিত অধিকার ফিরে পাওয়ার বাস্তবতার আনন্দ নিঃসন্দেহে সীমাহীন। কিন্তু ঈদুল আজহা তথা কুরবানীর ঈদে বাহ্যতঃ এ জাতীয় আনন্দের কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়না শুধুমাত্র গো মাংস এর নেশা ছাড়া। সংগত কারণেই

প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত এ কুরবানীর ঈদে আমাদের আনন্দ খুশীর কারণ কি এবং এ কুরবানীর ঈদ আমাদের জন্য কি শিক্ষা নিয়ে আসে যথার্থভাবে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন
হওয়া উচিত। অন্যথায় রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত এ উৎসবটি তার সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি অসার ও অযৌক্তিক নিছক ধর্মীয় বিষয়ের অবতারনা করবে।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ

আল-কুরআন, হাদিসে রাসুল (সাঃ) এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে এ প্রাসঙ্গিক যে তথ্য পাওয়া যায় তার সার বিষয়বস্তু হলো - প্রায় ৪(চার) হাজার বছর আগে ইরাকে আল্লাহর এক বান্দা তৎকালীন খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থা তথা নমরুদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের দাবী তোলেন এবং ধর্মের নামে শোষনের হাতিয়ার প্রতিকি মুর্তিগুলি ভেংগে ফেলেন। এরই প্রেক্ষিতে শাসক নমরুদের সভাসদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ডের সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর গোলাম-একনিষ্ঠ বান্দা হযরত ইব্রাহীম তাঁর দ্বীন তথা আদর্শের জন্য নিজকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হলেন। উন্মুক্ত লেলিহান অগ্নিকুন্ডে ঝাপ দিলেন- ফেরেশতাদের সাহায্য পর্যন্ত চাইলেন না। ঈমানের প্রথম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর এই অনুগত বান্দাকে ঐশী ব্যবস্থায় হিফাজত করে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে আরোও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। বিয়াবান মরুভূমিতে স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে চলে আসার নির্দেশ দিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর মনিবের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে কুরবানীর নজরানা পেশ করেন। কিন্তু আল্লাহ যেন তাঁর এ গোলামের ধৈর্য্য এবং ত্যাগের শেষ সীমা দেখতে চাইলেন - নির্দেশ দিলেন দ্বীনের

ঈদের খুশীতে সবাই খুশী। ঈদের স্রষ্টা ও প্রণেতাকে বিশ্বাস করেন না, মানেন না এমন নগণ্য সংখ্যক বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিরাও ঈদের আনন্দ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না- রাখেন না। যে কোনভাবেই সম্পৃক্ত থাকেন। এটাই বাস্তবতা। ঈদ উৎসব- আমাদের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত আনন্দ উৎসব। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এটি একটি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ। অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বাস্তব প্রেক্ষিতের কারণেই নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিকরাও ঈদের আনন্দ হাইজ্যাক করে থাকেন। ঈদগাহে যান, নামাজ আদায় করেন (ফজরের ফরজ

জন্য বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে পাওয়া একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে জবাই করে কুরবানী দেয়ার জন্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানীয়াতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় এবারও উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ তাঁর এ গোলামের সর্বোচ্চ কুরবানীতে খুশী হয়ে ঐশী ব্যবস্থাপনায় ইসমাঈলের বদলে একটি দুম্বাকে জবাই করিয়ে নিলেন। আর হযরত ইব্রাহীমকে পূর্ণ আনুগত্যশীল বান্দা তথা খাঁটি মুসলিম হিসেবে কবুল করে নিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মুসলিম মিল্লাতের আদর্শ পিতার সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করে দিলেন। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঈমানের অব্যাহত ধারাবাহিক পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর পরম আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-ই হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবানীর ধারাবাহিক ঘটনাবলীর ইতিহাস।

কুরবানীর এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো যদিও ভিন্ন পটে সংঘটিত হয়েছে তবুও প্রতিটি ঘটনার আদর্শিক দিক তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ এক আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিত্ব- এর বিসর্জন। সোজা কথায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন
প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সর্বোচ্চ কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়া। হযরত ইব্রাহীমের ত্যাগ ও কুরবানীর এ-ই ভিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা ছিল আপন পুত্রের গলায় নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে জবাই করার মত নজীরবিহীন ঘটনা। আর এ ঘটনার স্মারক হিসেবে মুসলিম মিল্লাতে প্রতীকি কুরবানীর মাধ্যমে ঈদুল আজহা পালিত হয়ে আসছে।

নামাজ কাযা রেখেই), কোলাকুলি করেন, শুভেচ্ছা জানান, বিবৃতি দেন, ঈদ পূনর্মিলনীতে যান।

কুরবানীর এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো যদিও ভিন্ন পটে সংঘটিত হয়েছে তবুও প্রতিটি ঘটনার আদর্শিক দিক তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ এক আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিত্ব- এর বিসর্জন। সোজা কথায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সর্বোচ্চ কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়া। হযরত ইব্রাহীমের ত্যাগ ও কুরবানীর এ-ই ভিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা ছিল আপন পুত্রের

হযরত ইব্রাহীমের এই ঘটনাবলির বিশ্লেষন করলে যে বিষয়গুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠে, তা হলোঃ এক, ইব্রাহীম তৎকালীন সমাজের ধর্মগুরুর সুযোগ্য সন্তান হয়েও এবং প্রচলিত সামাজিক রেওয়াজ অনুযায়ী পরবর্তী ধর্মগুরুর আসনে সমাসীন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তিনি প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। নেতৃত্বের খায়েশ ও লোভ তাঁকে তাঁর ঈমানী দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। দুই, এভাবে কার্যতঃ তিনি তাঁর নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলেন। তিন, সামাজিক শোষনের হাতিয়ার তারকা দেবতাদের কল্পিত মূর্তিগুলো ভেংগে ফেলার মাধ্যমে তিনি কার্যতঃ ধর্মীয় সামাজিক শোষন তথা নমরুদী শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেকে চরম বিপদগ্রস্ত করতেও কুণ্ঠিত হোননি। নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকা পূর্ণঅনুভূতি সহকারে উপলব্ধি করেও তিনি দ্বীনি দায়িত্ব পালন তথা আদর্শিক কাজ থেকে বিরত থাকেননি। চার, বিজন মরুভূমিতে প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশকেও নির্দ্বিধায় তিনি পালন করলেন। কেন এ কঠোর নির্দেশ? এ প্রশ্ন একবারও তাঁকে ব্যাকুল করেনি। পাঁচ, সবশেষে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে নিজ হাতে জবাই করার নিষ্ঠুর নির্দেশও তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করলেন। কেন এ নির্মম আদেশ? এ প্রশ্নটিও তাঁকে ক্ষনিকের জন্যেও বিচলিত করেনি। বরং দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহর নির্দেশ পালনের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি পরমাত্মিক আনন্দে স্থিতি লাভ করলেন। সুতরাং ইব্রাহীমের এ আনন্দ ছিল (১) পরম আদর্শিক প্রয়োজনে পরম সত্তার জন্য আত্মবিজয়ের আনন্দ, আত্ম বিসর্জনের আনন্দ। (২) প্রিয় কামনা, বস্তু ও

গলায় নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে জবাই করার মত নজীরবিহীন ঘটনা।

হযরত ইব্রাহীমের এ-ই কুরবানীর ঘটনার স্মারক হিসেবে আল্লাহ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য পশু কুরবানী দেয় ওয়াজিব করে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো- একজন মুসলিম ব্যক্তি সারা বছর শেষে একটি পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর পথে সার্বিক সময়, সম্পদ ও জীবন কুরবানের জযবা হাসিল করবে এবং আরেকটি কুরবানীর ঈদ আসার আগ পর্যন্ত এ-ই ত্যাগী মানসিকতার আলোকে পরিচ্ছন্ন ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে এভাবেই একজন মুসলিম সারা বছর আল্লাহর আইনের অনুগত থেকে নফসের কুরবানী, সময়ের কুরবানী তথা সামগ্রীক প্রচেষ্টা আল্লাহর পথে ব্যয় করার পর একটি বছর শেষে পশু কুরবানীর মাধ্যমে, জীবন কুরবানীর প্রতিকি উৎসব পালন করে ঈদুল আজহায়।

বিষয় আল্লাহর পথে কুরবানী দেয়ার আনন্দ (৩) আল্লাহর আইন মেনে চলার আনন্দ (৪) আল্লাহকে খুশি করার আনন্দ। সুতরাং হযরত ইব্রাহীমের অনুসরণে প্রকৃত মুমিন বা মুসলিম হওয়ার জন্য আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলার মাধ্যমে

আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের বাস্তব স্বীকৃতি দিতে হবে। (১) দ্বিধাহীন ও সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করতে হবে (২) আল্লাহর আইন মেনে চলার বাস্তব প্রয়োজনেই আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রচেষ্টা চালাতে হবে (৩) নফসের খাহেশাতের উপর আল্লাহর আইনকে বিজয়ী করতে হবে (৪) উল্লেখিত সবকটি ক্ষেত্রে যত বড় রকমের ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন হোক না কেন আল্লাহর দেয়া সবটুকুন সামর্থ্য দিয়েই তা করতে হবে।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন হওয়ার তরিকা। হযরত ইব্রাহীমের এ-ই কুরবানীর ঘটনার স্মারক হিসেবে আল্লাহ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য পশু কুরবানী দেয়া ওয়াজিব করে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো- একজন মুসলিম ব্যক্তি সারা বছর শেষে একটি পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর পথে সার্বিক সময়, সম্পদ ও জীবন কুরবানের জযবা হাসিল করবে এবং আরেকটি কুরবানীর ঈদ আসার আগ পর্যন্ত এ-ই ত্যাগী

মানসিকতার আলোকে পরিচ্ছন্ন ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে। এভাবেই একজন মুসলিম সারা বছর আল্লাহর আইনের অনুগত থেকে নফসের কুরবানী, সময়ের কুরবানী তথা সামগ্রীক প্রচেষ্টা আল্লাহর পথে ব্যয় করার পর একটি বছর শেষে পশু কুরবানীর মাধ্যমে, জীবন কুরবানীর প্রতিকি উৎসব পালন করে ঈদুল আজহায়। আর আল্লাহর পথে সারা বছরের সামগ্রিক কুরবানীর আত্মিক আনন্দে উল্লসিত হয়, তার সার্বিক চেষ্টা ও কুরবানী আল্লাহ কবুল করেছেন- খুশি হয়েছেন এই অনুভূতিতে পরম আত্মিক আনন্দ উপভোগ করে। এই হচ্ছে কুরবানীর ঈদের আনন্দের প্রকৃত কারণ। সুতরাং প্রকৃত অর্থে ঈদের আনন্দ উপভোগের অধিকার তো শুধু তাদেরই যারা উপরোক্ত পন্থায় নিজকে খাঁটি মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো- প্রতিবছর ঈদ আসে ৯০% মুসলমানের এই দেশে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ- আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ গরু কুরবানী দেয়া হয়। কয়েক কোটি মানুষ ঈদগাহে সমবেত হয় একই আদর্শ - পদ্ধতির অধীনে কিন্তু কুরবানীর সেই শিক্ষা ও আদর্শ থেকে গোটা দেশ ও জাতি বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। জাতীয় নেতৃত্বে সমাসীন সরকারী দল, বিরোধী দল (২/১টি ব্যতিক্রম

ছাড়া), আমলা, বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। যদিও আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করি কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা মুসলিম কিনা সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আসলে আমরা নামধারী মুসলমান, আদর্শিক মুসলমান হয়ে উঠতে পারিনি। মুসলমান পিতার ঘরে জন্ম হয়েছে বলেই আমরা সৌভাগ্যবশতঃ মুসলমান হয়েছি। আমাদের আচরন তা-ই প্রমাণ করে। ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয়ভাবে। ফলে আমাদের জাতীয় সত্তায় নেই সংহতি; নেই সুশৃংখল ঐক্য। শতধায় বিভক্ত আমাদের জাতীয় মানস-আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা ধাবিত হচ্ছি বিভক্তির দিকে। ভয়াবহ পরিণতি হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। এখনও সময় আছে প্রত্যাবর্তনের, আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ পুনর্গঠনের , জাতীয় উৎস সনাক্ত করার এবং সুসংহত জাতীয় অস্তিত্বের জন্য জাতীয় আদর্শের পুর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠার। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বুল আলামিন- নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই শুধু মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য- আল কুরআন। এই মহান শাশ্বত কুরআনিক শ্লোগানে উজ্জীবিত হোক- উৎসারিত হোক উৎসর্গকৃত হোক আমাদের জাতীয় সত্তা, জাতীয় জীবন।

দৈনিক জালালাবাদ, ঈদুল আজহা সংখ্যা '৯৬-এ প্রকাশিত।

লেখক পরিচিতি

শিকদার মুহাম্মাদ কিব্রিয়াহ (৩০)

গ্রামীন ও শহুরে সমন্বয়ে সমৃদ্ধ নৈসর্গিক পরিবেশে বেড়ে উঠা এক দার্শনিক মননশীল রোমান্টিক সাহিত্যিক সত্তা। সাহিত্যের প্রতিটি অংগনেই কুশলী কারিগর- স্বচ্ছন্দ বিচরন- বলিষ্ট, গতিশীল, সাবলিল এবং প্রাণস্পর্শী-প্রাজ্ঞ উচ্চারন। তাঁর সাহিত্য কর্ম একই সাথে আদর্শিক এবং নান্দনিক। কাব্য ও শিল্পকলায় জীবনানন্দ, ফররুখ এবং আল মাহমুদের সমৃদ্ধ সমন্বয় ঘটে।

ছোটবেলা থেকেই জীবন জিজ্ঞাসার অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁকে দার্শনিক মনস্ক করে তোলে। একটি আদর্শিক জীবনের আবশ্যিকতায় সাম্যবাদের ডাক তাঁকে মুগ্ধ করে। মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র কিব্রিয়াহ মার্কস-লেলিনকে আদর্শ জ্ঞান করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন। জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের সাথে সাথে প্রচলিত ধর্মে উদাসীন হয়ে উঠেন এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যথাসম্ভব বর্জন করতে থাকেন। মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নাস্তিকতার পর্যায়ে নিপতিত হয়। অতঃপর মার্কসবাদের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন ক্রমেই তাঁকে নিরাশ করতে শুরু করে। ষ্টেট ক্যাপিটালিজম, এক দলীয় শাসন (স্বৈর), ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা, যোগ্যতমের বিকাশ, সাম্যের অস্বাভাবিক ধারনা, প্রতিবিপ্লব ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা হারাতে থাকেন। ইত্যবসরে ৮৫ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হোন। একমাস কারাবাসের অবকাশকালীন অধ্যয়নে তিনি প্রাজ্ঞিক চিন্তায় কম্যুনিজম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ করেন বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচন্ড গনবিপ্লব - এক পর্যায়ে ধ্বসে পড়ে বার্লিন প্রাচীর, পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট ব্লক ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাত্ত্বিক চিন্তার মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে তিনি অভিভূত হোন, আশাবাদী হোন আত্ম প্রত্যয়ে। পরম সত্য ও পরম জীবন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন - অধ্যয়ন ও গবেষণা চলে অব্যাহত গতিতে - শিকড়ের সন্ধানে। প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ প্রয়োগে অবশেষে উপলব্ধি করেন পরম সত্যের স্বরূপ - পরম সত্তা ও পরম জীবনদর্শনের ধারনা। ১৯৮৯ সালে তিনি ইসলামী জীবনাদর্শকে কবুল করেন এবং বিশ্বাসের স্বপক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী অবস্থানে স্থিতি লাভ করেন। পরম সত্যের প্রকাশ এবং পরম আদর্শের বিজয়, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মাধ্যমে পরম সত্তার সন্তুষ্টি অর্জনেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।